বিজ্ঞান ও সমাজ বিষয়ক দ্বিমাসিক

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

কলকাতা ± ট্রাম = ?

"নীল বিপ্লব"

সোভিয়েত দূষণ

শক্তির বিকল্প উৎস

স্টকহোম ঘোষণাপত্র

ছড়ায় ছবিতে পরিবেশ

বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা প্রকাশিত ——— ত্রয়োদশ বর্ষ □ ষষ্ঠ সংখ্যা □ মে-জুন 1990 ——— দাম দুই টাকা

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

মে-জুন 1990 □ ত্রয়োদশ বর্ষ □ ষষ্ঠ সংখ্যা

এই সংখ্যার বিষয়

1 বি ও বি-র কথা

2 ট্রামের কোনো বিকল্প নেই
□ দেবাশিস ভট্টাচার্য

4 কলকাতার পরিবহন ব্যবস্থার বিশৃঙ্খলার জন্য কি ট্রামই দায়ী
□ কাজল রায়

6 বিকল্প শক্তি : সুসংহত শক্তি প্রকল্প
□ মূল : সত্যব্রত সেন ; ভাষান্তর : কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়

8 কোলাঘাট—আগামী দিনের ব্যাণ্ডেল
□ নিশীথ চৌধুরী

9 সমুদ্র দূষণ, আমরা ও "নীল বিপ্লব"
□ বিশুদ্ধানন্দ পুরকাইত

14 সমুদ্রের জীবন সম্পদ
□ ভৃগুনাথ সিং

15 "সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রকৃতি বিনাশ"
□ অনুবাদ : বিশুদ্ধানন্দ পুরকাইত

17 রুশ দেশে পরিবেশ আন্দোলনের বিকাশ
□ সংগ্রহ : প্রদীপ দত্ত

19 স্টকহোম ঘোষণাপত্র : মানব পরিবেশ সুরক্ষার দায়িত্ব ও অধিকার
□ অনুবাদ : মণীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার ও স্বপনকুমার শীল

21 বড় বাঁধ—নর্মদা : একটি আলোচনা
□ প্রতিবেদক

22 পরিবেশ ছড়া
□ ছড়া : নিশীথ চৌধুরী : ছবি : সুপর্ণ চৌধুরী

23 চিঠিপত্র : "র‍্যাডিক্যাল অ্যানথোপলজি"র র‍্যাডিক্যালত্ব কোথায়
□ সুজয় মোদক

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মীর গ্রাহকদের প্রতি

বাৎসরিক গ্রাহক চাঁদা বারো টাকায়। বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। পত্রিকা ডাকে পাঠানোর ব্যবস্থা আছে। সেক্ষেত্রে ডাক মাশুল সহ গ্রাহক চাঁদা পনেরো টাকা। "বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী—এই নামে ব্যাঙ্ক ড্রাফট্ বা মানি-অর্ডার করে টাকা পাঠাতে পারেন। কুপনের নীচে নাম-ঠিকানার স্পষ্ট উল্লেখ প্রয়োজন।

প্রযত্নে : অভিজিৎ লাহিড়ী [] B2 বৈশাখী [] 153/1 যশোহর রোড, কলিকাতা 700074 (ফোন 59-7357) []

'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী' আবার নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে! পুরোনো গ্রাহকদের কাছে অনুরোধ, যাঁরা এখনও তাঁদের গ্রাহক চাঁদা আমাদের কাছে পাঠাননি—যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব সেটা পাঠিয়ে দেবার চেষ্টা করবেন।

পড়ে দেখুন

উৎস মানুষ / মাসিক গণস্বাস্থ্য / গণদর্পণ / মানবমন / Safe Energy And Environment / বিশ্লেষণ / দ্বান্দ্বিক (দুর্গাপুর) / বিজ্ঞান মনীষা / স্বাস্থ্য ও পরিবেশ / Science for Society Thought Manushi.

যাঁরা কাজ করেছেন

কম্পোজ □ গীতশ্রী সেন, স্বপন সেন গোপাল ঘোষ, দুলাল বোস, কার্তিক ভৌমিক ॥ মেক্‌আপ্ □ স্বপন সেন।

মেশিনম্যান □ রামপ্রসাদ ॥ বাইণ্ডিং □ লক্ষণদাস।

মুদ্রক □ পূর্ণেন্দু বিশ্বাস ॥

বি, ও, বি-র এবারের সম্পাদনায়

বিশুদ্ধানন্দ পুরকাইত, রবীন মজুমদার, সুভাষ গাঙ্গুলী, স্বাতী গুপ্ত, প্রদীপ দত্ত, অসীম মুখোপাধ্যায়, শেখর মুখোপাধ্যায়, কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নিখিলেশ পাল, সুজয় মোদক, কাজল রায় এবং সুদীপ্ত সরস্বতী

বি ও বি-র কথা

ভেতরের পাতাতে ছোট্ট পরিসরে একটি সংবাদ প্রচারিত হয়েছে গত 8. 9. 90 তারিখে গণশক্তি দৈনিকে। বালিয়াপাল ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি বাতিল করার দাবিতে জনতা দলের সাংসদ সমরেন্দ্র কুণ্ডুর নেতৃত্বে বালিয়াপাল-ভোগরাই অঞ্চলের আন্দোলনরত মানুষের প্রতিনিধিরা প্রধানমন্ত্রী ভি পি সিং-এর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। দিয়েছেন এক স্মারকলিপিও। অবাক হতে হয় এ কারণে যে এখনো সংশয় কাটে নি। ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি বাতিলের সরকারি ঘোষণা এখনো হয় নি। যদিও শাসকদলের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ভিন্ন কথায় ছিল অলংকৃত। সিংহাসনে সমারূঢ় হবার পর হয়তো শাসকদের বিবেক বন্ধক দিতে হয়! অথবা বন্ধকদান পর্বটি আগেই সম্পন্ন করে তাঁদের শাসনদণ্ডখানি তুলে নিতে হয়! নয়তো ঐ ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি বাতিল হয় না কেন? গন্ধমর্দন পর্বতের পরিবেশ নষ্ট হবার আশঙ্কায় রাজীব জমানাতেই ধামাচাপা দেওয়া বালকো প্রকল্প আবার পুনর্জীবিত হয় কেন? টেহরি বাঁধ নির্মাণে সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ কেন? কেনই বা নর্মদা-প্রকল্পের বিরুদ্ধে পরিবেশ আন্দোলনকারী নেতাদের গালি শুনতে হয় স্বয়ং জলসম্পদ মন্ত্রীর কাছ থেকে—বিদেশী দালাল বলে?

অথচ এঁদের পরিবেশ সংরক্ষণ নিয়ে কত না অশ্রুপাত করতে দেখেছি! আহত তিমি মাছকে জলে নামিয়ে দিতে দেখেছি। কচি মেষশাবকের চামড়ার টুপি পরা ছাড়তে দেখেছি। জীপের ধাক্কায় ময়ূরের জীবনান্ত হয়েছে বলে প্রধান-মন্ত্রীর পদত্যাগের দাবীতে লোকসভা-মন্থন করতে দেখেছি। কমনওয়েলথ সম্মেলনে বা সার্ক অধিবেশনে দেখেছি ভারতের পক্ষে বক্তৃতা দিতে গিয়ে অতি বড় পরিবেশপ্রেমী সাজতে। আর জাতি সংঘে তো কথাই নেই।

ছবিতে দেখেছি অর্ধনারীশ্বর। তাঁর বদন মণ্ডলের এক পাশে নোলক—অন্য পাশে মোহনচূড়া। দ্বৈত সত্তা তাঁর। তিনিই পুরুষ। তিনিই প্রকৃতি।

প্রাক-নির্বাচন পর্বে এঁরা পরিবেশ রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেন। নির্বাচনোত্তর পর্বে পরিবেশ ধ্বংসের খেলায় মেতে ওঠেন।

এই প্রেক্ষাপটে ভারতের পরিবেশ আন্দোলন গড়ে উঠছে। অন্যান্য হরেক আন্দোলনের থেকে বয়সে নবীন এই আন্দোলন মূলতঃ চার ধারাতে বিভক্ত। গান্ধীদর্শন প্রভাবিত ধারা, যথোপযুক্ত প্রযুক্তির প্রবক্তাদের ধারা, লাল-সবুজদের ধারা আর বিশুদ্ধ সবুজ ধারা।

পরিবেশের সমস্যা বহুমাত্রিক। পরিবেশ আন্দোলনের এক একটা ধারায় একটা-দুটো মাত্রা বা দিক বেশি গুরুত্ব পায়—অন্যান্য নানা দিক উপেক্ষিতই থেকে যায়। আন্দোলন হয় একপাশ থেকে। কাজেই, আমরা মনে করি, পরিবেশ আন্দোলনের নানা ধারা পরস্পরের প্রতিযোগী তো নয়ই, বরং পরস্পরের পরিপূরক। প্রতিযোগিতার অসুস্থ সম্পর্ক নয়, বরং পরিবেশ আন্দোলনের নানা ধারা উপধারার মধ্যে গড়ে উঠুক পারস্পরিক সহযোগিতা, পারস্পরিক নির্ভরতা, পারস্পরিক সংযোগের এক বাতাবরণ—জন্ম নিক পরিবেশ আন্দোলনের এক ইকোলজিভিত্তিক নেটওয়ার্ক। শত ফুল বিকশিত হোক সবুজ ময়দানেও। □

ট্রামের কোনো বিকল্প নেই

দেবাশিস ভট্টাচার্য

ট্রামের সঙ্গে লেখকের ঘনিষ্ঠতা আশৈশব, কলকাতায় বসবাসের সূত্রে। তথ্যসমৃদ্ধ যুক্তির উপস্থাপনায় এই অভিজ্ঞতার পাশাপাশি অন্য কিছু দেশের পরিবহন ব্যবস্থার সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয়ও কাজে লেগেছে। —স. ম.

পৃথিবীর বড় ও মাঝারি শহরের যাত্রী পরিবহনের ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে 1890 সালের পর থেকে পর্যায়ক্রমে ট্রামপথের সৃষ্টি হয় এবং অসম্ভব জনপ্রিয়তা লাভ করে। 1930 সালের পরে ক্রমশ পেট্রোল (পরে ডিজেল) ইঞ্জিনের উন্নতি ও সাথে সাথে পৃথিবীতে পেট্রোলিয়াম খনিজের বিরাট উৎসের সন্ধানের পরে বাস শিল্পের উন্নতি হয়। বাস চালানোর প্রাথমিক খরচ কম এবং যেকোনো পথে চলার সুবিধার জন্য পৃথিবীর অনেক শহর থেকে প্রতিযোগিতায় ট্রাম উঠে যায়। 1960 সাল পর্যন্ত এটা ছিল যাত্রী পরিবহনের সাধারণ চিত্র। কিন্তু গত 30 বছরে বহু শহরে জনস্ফীতি, পেট্রোলিয়াম দ্রব্যের আকাল, যানজট ও বায়ুদূষণের পরিপ্রেক্ষিতে দীর্ঘ-মেয়াদী অর্থসাশ্রয়কারী ও নির্ভরযোগ্য পরিবহনের অঙ্গ হিসেবে পুনরায় পাঁচটি মহাদেশের 247টি শহরে ট্রাম ফিরে এসেছে। এমনকি তেলের খনি আরব দেশেও ট্রাম চলাচল শুরু হয়েছে বেশ কয়েক বছর।

কলকাতার ট্রাম

বর্তমানে আমরা কলকাতার ট্রামের যে বিস্তার দেখছি তা অঞ্চল বিশেষে 50-100 বছরের পুরনো। হাওড়া শহর ও নিমতলা বিভাগে আগে ট্রাম চালু ছিল, নতুন সংযোগ হয়েছে বিধাননগর ও জোকা বিভাগে। ভবানীপুরের 2-3 km কাটা লাইন প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও 17 বছর ধরে জোড়ার অপেক্ষায়। স্বাধীনতার পরে (1948) স্টেটবাস পথে যোগ দিলে শহরে বেসরকারি বাস ঢোকা নিষিদ্ধ হয়। তখনও এই শহর মূলতঃ ট্রামের দখলে ছিল এবং অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে 500 ট্রাম যাত্রী পরিবহনের দায়িত্ব মিটিয়েছে। বেসরকারী বাস পুনরায় ঢুকতে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সরকারী পরিবহন ব্যবস্থার অপদার্থতা প্রকট হয়ে ওঠে। বর্তমানে রাস্তায় পরিকল্পনাহীনভাবে নামানো কয়েক হাজার বাস-মিনিবাস ট্রামের অস্তিত্বকে বিপন্ন করেছে। প্রশ্ন উঠেছে ট্রাম থাকবে কিনা।

পথের আইন ও ট্রাম-বিরোধী লবী

কলকাতা পৃথিবীর এমন এক শহর যেখানে 'Keep to the left' ছাড়া দ্বিতীয় কোনো ট্রাফিক আইন আক্ষরিক অর্থে নেই। এই অবস্থায় শহরের পরিবহনের যে ভগ্নদশা হয় কলকাতারও তাই হয়েছে। এর চাপ এসে পড়েছে ট্রামওয়েজের ওপর। এটা পরিষ্কার যে ট্রাম উঠে গেলে ও স্টেটবাস পঙ্গু হয়ে থাকলে দারুণভাবে লাভবান হবে বেসরকারি পরিবহনের মালিকরা। তাই ট্রাম-বিরোধী লবি সৃষ্টিতে তাঁদের অদৃশ্য অবদান অনস্বীকার্য। এটা অত্যন্ত ঘৃণ্য এক রাজনৈতিক দিক—এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়।

অর্থনৈতিক দিক

এদিক থেকে ট্রাম সবচেয়ে সস্তার পরিবহন। মসৃণ লোহার রেলের ওপর চলে বলে ট্রাম চালানোতে ন্যূনতম শক্তির প্রয়োজন হয়। এছাড়া শহরের ট্রাফিক জ্যামের রাস্তায় মাথাপিছু যাত্রী পরিবহনে ট্রামে বাসের দশ ভাগের এক ভাগ জ্বালানী খরচ হয়। ট্রাফিক জ্যামে ট্রামের ইঞ্জিন চালু রাখা খরচশূন্য। একটা ট্রাম তৈরী করলে অনায়াসে 50 বছর ব্যবহার করা যায়; পরের 25 বছর মেরামতি ও যত্নের দরকার হয়। যাত্রী পরিবহনে 75 বছর অন্য কোনো গাড়ীর ব্যবহার চিন্তা করা অসম্ভব। এই সত্য আমরা নিজের চোখে দেখেছি কলকাতার B-B Coach ট্রামের ক্ষেত্রে। বর্তমানে এগুলি তুলে নেওয়া হয়েছে প্রায় 100 বছর ব্যবহারের পরে। পরের পৃষ্ঠায় টেবলের হিসাবটি দেখুন।

যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্য

ট্রামের যাত্রায় ব্রেক বা স্টার্টের সময়ে এবং লাইনে চলে বলে গর্ত, খানাখন্দ বা বাঁকের সময়ে কোনো ঝাঁকানি লাগেনা। বডি ডিজাইনের দিক থেকে ট্রাম অত্যন্ত উন্নত। রাস্তা থেকে একটি মাত্র পাদানির সাহায্যে সমতল মূল মেঝেতে পৌঁছানো যায়। এক্ষেত্রে বাসে চারটি সিঁড়ি ভেঙে উঠতে হয়। এর প্রথমটি রাস্তা ও চাকার স্প্রিং-এর উপর নির্ভর ক'রে দুই ফুট পর্যন্ত হয়। ট্রামের ছাদ লোক দাঁড়ালে তার থেকে তিন ফুট উঁচুতে থাকে বলে হাওয়া-বাতাস খেলার যথেষ্ট জায়গা মেলে। তাছাড়া ট্রামের উপরের ছাদ ও নীচের সিলিঙের মাঝে ছয় ইঞ্চি ফাঁক আছে। এটা গ্রীষ্মে নিরোধক হিসেবে ছাদের তাপ নীচে ঢুকতে দেয় না।

লগ্নির পরিমাণ	গাড়ী	সংখ্যা	ক'টি একতলা বাসের সমতুল (a)	গাড়ী প্রতি পরমায়ু (বঃ) (b)*	এক বছর ধরে চলা সমতুল বাস সংখ্যা (Bus Year) a × b	নিট লাভ/ক্ষতি
44 লক্ষ টাকা	2 কোচের ট্রাম	1	2	50	100	100 − 35 = 65 বছর ধরে বিনামূল্যে একটি একতলা বাসের সার্ভিস (বাসের তুলনায়)
	একতলা বাস	7	7	5	35	ট্রামের তুলনায় এক বছর ধরে 65টি বাসের সার্ভিস খরচের সমান ক্ষতি।

* ট্রামের পরমায়ু 50 থেকে 75 পর্যন্ত হয়। এখানে ন্যূনতম ধরা হয়েছে। সূত্রঃ রাজ্য পরিবহন দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

বাসে এই দুটো ফাঁকা অংশ একেবারে থাকেনা। ফলে অত্যধিক গরম ও গুমোট অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ট্রামে সবদিকে 2 বর্গফুট বড় বড় খোলা জানলা থাকায় আলো হাওয়া ঢোকায় কোনো বাধা থাকেনা। জানলার ওপরে অতিরিক্ত কাঁচের দেওয়ালের মধ্যে দিয়ে দাঁড়ানো যাত্রীরা গন্তব্যস্থল দেখতে পান। প্রাইভেট ও স্টেট বাসের জানালা এমনভাবে তৈরী যে জানলার ধারে লোক বসলে হাওয়া ঢোকা বন্ধ হয়ে যায় এবং দাঁড়ানো যাত্রীদের বাইরে দেখার কোনো উপায় থাকেনা। ট্রামের মেশিন ছাদে থাকে বলে গরমভাব, শব্দ ইত্যাদি কিছু বোঝা যায় না। প্রথম শ্রেণীতে তিনটি বড় পাখা স্বাচ্ছন্দ্য আরো বাড়িয়ে তোলে। খুব ভারী গাড়ী বলে ট্রামের যাত্রীরা কোনো দুর্ঘটনায় সব থেকে নিরাপদে থাকেন। বহু সময়ে দেখা যায় দুর্ঘটনায় জড়িত দ্বিতীয় গাড়ীটি ভেঙে চুরমার হয়ে গেলেও ট্রামের যাত্রীরা প্রায় আহত হনই না। যেখানে 'বুলেভার্ডে' ট্রাম চলে, সেইসব স্টপেজ ওঠা নামার পক্ষে খুব নিরাপদ। কলকাতায় বাসে ওঠানামার মত বিপজ্জনক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পরিবেশগত দিক

মেট্রোরেল বাদে ট্রাম একমাত্র শহরের পরিবহন যা একেবারে দূষণমুক্ত। বাস থেকে নির্গত কালো ধোঁয়া, যা রোধ করার কোনো ব্যবস্থা বা ইচ্ছা কলকাতায় আদপেই নেই, পেটের আন্ত্রিক রোগ ছাড়া যা যা রোগ মনে করতে পারেন তার সমস্তই সৃষ্টি করে। যে কোনো কাজের দিন ডালহৌসি বা চৌরঙ্গীর আকাশের দিকে তাকালে বাদামী রঙের বিষাক্ত আবহাওয়া স্পষ্ট চোখে পড়ে। ট্রাম যে কেবলমাত্র দূষণমুক্ত তাই নয়, শহরের বুলেভার্ড ও ময়দানের ঘাসের আস্তরনের সবুজ সৌন্দর্য নষ্ট না করে অনায়াসে চলতে পারে। ট্রাম চললে পিচের রাস্তার বিন্দুমাত্র ক্ষতি হয় না। বিদ্যুৎ তৈরীতে দূষণ হয় ঠিকই, কিন্তু তা উৎপাদন-অঞ্চলে সীমিত, শহর থেকে দূরে। আর বিদ্যুৎ-উৎপাদনেও দূষণ ন্যূনতম করার বা রোধ করার বিকল্প সম্ভব।

বিশেষত কলকাতার জন্য

এখনও ট্রামওয়েজ সব থেকে শৃঙ্খলাবদ্ধ পরিবহন সংস্থা। পশ্চিমবঙ্গের নিজস্ব তিনটি রাজ্য-পরিবহনের শুরু থেকেই শোচনীয় ব্যর্থতা দেখে লেখকের এই ধারণা হয়েছে। ট্রামের কোনো রানিং স্টাফের চুরি এখনও পর্যন্ত আমার চোখে পড়েনি। এর পরোক্ষ প্রমাণ প্রতিবার ভাড়া বৃদ্ধির পরে সমানুপাতে ট্রামের রোজগার বেড়েছে। অথচ স্টেটবাসে প্রতিবার তুলনায় কম হারে বেড়েছে, চুরি ও ফাঁকির হার বৃদ্ধি পেয়েছে (বিশ্বব্যাঙ্কের রিপোর্ট)। বিশ্বব্যাঙ্কের টাকায় নতুন গাড়ী কিনে ট্রামের সংখ্যা বেড়েছে, বাস একেবারেই নয়। বেসরকারি ট্রাম না থাকায় স্টেটবাসের মতো ট্রামের যন্ত্রাংশ চুরি হয়না। কারণ কিনবে কে? বিদ্যুতে চলে বলে তেল, মবিল, ব্যাটারি ইত্যাদি চুরির প্রশ্নও নেই। খুব ভোরে বা বেশ রাতে যখন রাস্তায় বাস থাকেনা তখন ট্রাম একমাত্র নিরাপদ পরিবহন। যাঁরা দশটা-পাঁচটা বা নিখুঁতভাবে বললে বারোটা-তিনটে, অফিস করেন তাঁদের চোখে এটা পড়েনা। মহিলা, শিশু ও বৃদ্ধদের বস্তুত দ্বিতীয়ঃকোনো সুষ্ঠু পরিবহন ব্যবস্থা শহরে নেই।

ট্রামের অসুবিধার অনেক কারণ 'অ্যান্টি ট্রাম লবি'র সৃষ্টি—প্রতিকারের উপায়

যে সব গাড়ী লাইনের ওপর চলে মসৃণতার জন্য তাতে তাড়াতাড়ি গতিবৃদ্ধি বা ব্রেক করা যায় না। বিশেষত বৃষ্টির সময়। এর সুফল, চালানোতে কম শক্তি লাগে ও ঝাঁকানি হয়না। যদি প্রতিনিয়ত ট্রাম লাইনের ওপর অন্যগাড়ী উঠে আসে তবে ট্রামের গতি কমবে। শহরে গাড়ীর সংখ্যা অনিয়ন্ত্রিত হারে বৃদ্ধি ও আইন না মেনে যত্রতত্র ট্রাম লাইন অন্য গাড়ীর দ্বারা দখল, ট্রামের তথাকথিত ধীরগতির জন্য দায়ী। মোটা জরিমানা ও পুলিশ দক্ষ হলে ট্রামের রাস্তা পরিষ্কার হবেই। অনেক সময়ে

দেখা দেবে কিন্তু রাস্তায় গাড়ী দিনকে দিন বাড়তে থাকলে Conjestion Cost যে হারে বাড়বে, সেখানে সময়ের মূল্যকে হিসাবের মধ্যে আনলে প্রাইভেট গাড়ীর সপক্ষে কোনো যুক্তিকেই টেঁকানো যাবে না। এক প্রবীণ পরিবহন বিশেষজ্ঞ তো বেশ জোরের সঙ্গেই বললেন সল্টলেক, বি টি রোড সহ কলকাতার অনেকগুলি চওড়া রাস্তাতে এবং শহরতলীতে সাইকেল পথের সম্প্রসারণ হওয়া সম্ভব। এবং আগামীদিনে এসম্পর্কে যথেষ্ট ভাববার প্রয়োজন পড়বেই। এছাড়া জলপরিবহন ব্যবস্থার উন্নতির জন্যও যথেষ্ট বিবেচনার প্রয়োজন আছে। শহর কলকাতার ট্রাম-সহ সামগ্রিক পরিবহন ব্যবস্থা সম্পর্কে এঁদের বক্তব্য থেকে আর একটি ব্যাপার স্পষ্ট হয় যে প্রাইভেট অটোমোবাইলের উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ না করে পাবলিক বাস, ট্রাম, সাইকেল ও জল পরিবহন ব্যবস্থার উপর বেশী গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

যদিও মূল শহরে বাইসাইকেলকে গুরুত্ব দেবার সুযোগ কম, তবে শহরতলীতে ও সল্টলেকের মত ফাঁকা অঞ্চলে বাইসাইকেলের গুরুত্ব বাড়ানো যেতে পারে। এমন কি শহরের মধ্যেও কিছু সংকীর্ণ রাস্তাকে শুধু মাত্র পথচারী ও সাইকেল আরোহীদের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। □

বিকল্প শক্তি ঃ সুসংহত শক্তি প্রকল্প

সত্যব্রত সেন

প্রাক্‌কথন

আমাদের এটা জানা আছে যে সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি, জৈবশক্তি—এগুলি মানবসভ্যতার শক্তি-চাহিদা অনেকাংশে মেটাতে পারে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত এ ব্যাপারে যতটুকু প্রচেষ্টা দেখা গেছে সেগুলিকে বিক্ষিপ্ত, অসংবদ্ধ চরিত্রের বলা যেতে পারে। শক্তির যোগান স্থিতিশীল (steady) না হলে তা দিয়ে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের চাহিদা মেটানো সম্ভব নয়, বিশেষত অর্থকরী দিকগুলো বিবেচনা করে। কিন্তু প্রচলিত প্রচেষ্টায় তা সম্ভব নয়।

সেজন্য আমাদের উদ্দেশ্য হলো প্রথাগত পদ্ধতি থেকে বেরিয়ে সৌর, বায়ু ও জৈব—এই তিন শক্তির সম্মিলনে এক সুসংহত শক্তি উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তোলা যাতে শক্তি সরবরাহকে স্থিতিশীল (steady supply) রাখা যায়।

শক্তির কিছু কিছু বাণিজ্যিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে বেশ উচ্চ তাপমাত্রা বজায় রাখার প্রয়োজন হয় যেমন, লোনা জলের শুদ্ধিকরণে (desalination) —যা পানীয় জল, রান্না ইত্যাদি কাজে লাগে। সুন্দরবনের মতো অঞ্চলে এগুলি বাস্তব প্রয়োজন। সাধারণ জেলেনৌকায় বসানোর মতো প্যাকেজ কোল্ড-স্টোরেজ ইউনিট উদ্ভাবন করা সম্ভব হলে ঐসব অঞ্চল থেকে বিপুল পরিমাণে মাছ এনে বৃহত্তর কলকাতায় সরবরাহ করা যেতো।

শক্তি উৎপাদনের এই বিকল্প সুসংহত ব্যবস্থার জন্য পরিকল্পনা-পর্যায়েই এমনভাবে গোটা ব্যবস্থাকে ডিজাইন করতে হয় যাতে বিভিন্ন ধরণের শক্তির সুষম সমন্বয়ে শক্তি সরবরাহের মোট পরিমাণ স্থিতিশীল থাকে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন শক্তিগুলির উৎপাদনের হেরফেরকে (fluctuation) হিসাব করে সমগ্র ব্যবস্থায় এমন স্থিতিস্থাপকতা রাখা হয় যাতে উৎপাদিত মোট শক্তির পরিমাণ সর্বদাই প্রায় স্থিতিশীল থাকে।

প্রথাগত শক্তি উৎপাদনে ত্রুটি

তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলি জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করে কয়লাকে, যার দর মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে প্রতি বছর দ্রুত বাড়ছে। এই বৃহদায়তন প্রকল্পের চিমনিগুলি সর্বদা বিষাক্ত বাষ্প ছাড়ছে—যা থেকে ফুসফুসের রোগ, অ্যাসিড বৃষ্টি, অরণ্য ধ্বংস ইত্যাদি হয়। তাছাড়া সমগ্র সরবরাহ ব্যবস্থা চালু রাখতে গোটা দেশে বিদ্যুৎ-পরিবাহী তার ও টাওয়ার স্থাপন করতে হয়। এগুলির রক্ষণাবেক্ষণ, তার চুরি ও বিদ্যুতের সরবরাহকালীন অপচয় (transmission loss) সব মিলিয়ে বেশ ব্যয়বহুল ব্যাপার। এছাড়া গোটা ব্যবস্থাটাকে সচল রাখতে দরকার হয় প্রযুক্তিগত খুঁটিনাটিতে দক্ষ এক বিশাল সুশিক্ষিত কর্মীবাহিনীর—যার কিছুটা ঘাটতি রয়েছে আমাদের মতো দেশগুলিতে।

প্রস্তাবিত বিকল্প : সুসংহত শক্তি প্রকল্প

এই ব্যবস্থার জ্বালানী কার্যতঃ বিনামূল্যেই পাওয়া যায় এবং জল, বায়ু বা সৌরকিরণের ওপর মুদ্রাস্ফীতির কোনো প্রভাব নেই। 5 কিলোওয়াট থেকে 50 কিলোওয়াট ক্ষমতার ছোটো বিকেন্দ্রিত সুসংহত শক্তিপ্রকল্প সারা দেশে বহু সংখ্যায় গড়ে তুলতে পারলে তা থেকে বহু মেগাওয়াট শক্তি পাওয়া সম্ভব। তার ফলে সুদূর গ্রামের মানুষকেও আলো এবং শক্তি যোগান দেওয়া সম্ভব। উপরন্তু পরিবেশের ওপর এ ধরনের প্রকল্পের কোনো বিরূপ প্রভাব নেই। এই শক্তিপ্রকল্পগুলি চালানোর জন্য বেশি সূক্ষ্ম কারিগরীর প্রয়োজন নেই বলে গ্রামের অধিবাসীরা নিজেরাই এর

রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারবেন। তাছাড়া এগুলি চালানোর খরচও যৎসামান্য।

এ ধরনের শক্তিপ্রকল্পগুলিতে কোনো ভারী যন্ত্র লাগে না। যন্ত্রাংশ যা লাগে তা কোনো ছোটো শহরের কারখানাতেও স্থানীয় উপকরণ দিয়ে তৈরী করে নেয়া যেতে পারে।

সৌরশক্তির সম্ভাবনা

স্ট্যাণ্ডার্ড সংগ্রাহক (standard collector) এবং সৌরকোষ (solar cell) এদেশে জনপ্রিয় না হওয়ার কারণ সংগ্রাহকগুলি 110° সেন্টিগ্রেডের বেশি তাপমাত্রা দিতে পারে না এবং বর্তমানে সৌরকোষের দামও প্রচুর। এছাড়া তাপমাত্রা বাড়ার সমানুপাতে সৌরকোষের কার্যকারিতাও (efficiency) কমতে থাকে।

কিন্তু মেটাক্রিলেট (metacrylate) নামে সম্প্রতি উদ্ভাবিত একটি অপটিক্যাল আইটেমকে ব্যবহার করে সুলভমূল্যে এক ধরণের লেন্স প্রস্তুত করা সম্ভব যেটি আমাদের মতো প্রখর সূর্যালোকের দেশে 500° সেন্টিগ্রেড থেকে 1000° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা দেবে। এটি বাষ্পীয় ইঞ্জিন চালানোর কাজে লাগানো সম্ভব। অলটারনেটরকে টারবাইন-এর সঙ্গে যুক্ত করে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে লাগানো সম্ভব।

সৌরশক্তি-প্রকল্পের খুঁটিনাটি

কন্‌সেন্‌ট্রেটর (concentrator) উদ্ভাবনের পরে তার কারিগরী উন্নতি ঘটানো হয়েছে বাণিজ্যিক পদ্ধতিতে সৌরশক্তি উৎপাদনের জন্য। একটি প্যারাবোলা (parabola) আকৃতির ডিশের ওপরের সমগ্র তলে পতিত সৌররশ্মি প্রতিফলিত হয়ে কেন্দ্রীভূত হয় প্যারাবোলার ফোকাসে স্থিত গ্রাহক ক্ষেত্রে (receiver area)। এই প্যারাবোলার আকৃতির তলের বক্রতা যতো সঠিক হবে গ্রাহক ক্ষেত্রটি তত ছোটো হবে ফলে কেন্দ্রীভবনের (concentration) মাত্রাও বেশি হবে। এর মাত্রাকে আরও বাড়িয়ে তাপমাত্রার প্রয়োজনীয় বৃদ্ধি সম্ভব, যদি এরকম প্যারাবোলার সংখ্যা বাড়ানো যায় এবং প্রতিটি ডিশে কেন্দ্রীভূত সৌররশ্মিগুলিকে একটিমাত্র প্যারাবোলার গ্রাহক ক্ষেত্রে কেন্দ্রীভূত করা সম্ভব হয়।

এক্ষেত্রে কেন্দ্রীভবন (concentration) ও তাপমাত্রার পারস্পরিক সম্বন্ধকে প্রভাবিত করে—(i) ঐ স্থানে সৌররশ্মির তীব্রতা এবং (ii) প্রতিফলক / গ্রাহকের উৎকর্ষ। লক্ষণীয়, এভাবে কেন্দ্রীভবনের মাধ্যমে উচ্চ তাপমাত্রা অর্জন করে উচ্চতাপ ও চাপযুক্ত বাষ্পকে টারবাইন ঘোরানোর কাজে লাগানো যায় এবং কোনো ধরনের জীবাশ্ম-জ্বালানীর (fossil fuel) প্রয়োজন হয় না।

বায়ুশক্তি

বায়ুর গতিপ্রকৃতি খুবই খামখেয়ালী। কোনো বিশেষ সময়ে স্বাভাবিক গতির বহুগুণ বেশি গতিতে বায়ু বইতে দেখা যায়। এমন ক্ষেত্রে দেখা যেতে পারে যে হাওয়া-কলের (windmill) ওপরে হয়তো স্বাভাবিকের তুলনায় 60 গুণ বেশি বল প্রযুক্ত হয়েছে। হাওয়া-কলের কাঠামো সেইমতো মজবুত না হলে সেটি ভেঙে পড়াই স্বাভাবিক। আবার বেশি মজবুত করার খরচও বেশি এবং তাতেও যে প্রবলতম ঝড়ে রক্ষা পাওয়া যাবে এমন নিশ্চয়তা নেই।

সেজন্য এগুলি এমনভাবে ডিজাইন করা উচিত যাতে কাঠামোটা ভেঙে পড়লেও যন্ত্রাংশগুলি টাইফুনের আঘাতেও নষ্ট না হয়। তাহলে যন্ত্রাংশগুলিকে যৎসামান্য খরচে আবার জোড়া লাগিয়ে দেওয়া যায়। হাওয়া-কল তৈরীর কাজে বাইসাইকেলের যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা যেতে পারে যাতে এটির নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতির ব্যাপারটা গ্রামবাসীদের আয়ত্তের মধ্যেই থাকে। উল্লম্ব অক্ষের (vertical axis) হাওয়া-কলগুলিকে জল তোলার পাম্প বা চালগুঁড়ো করার যন্ত্র চালাবার কাজে লাগানো যায়। অনুভূমিক অক্ষের (horizontal axis) হাওয়া-কলগুলি ব্যাটারী চার্জ করা বা জল তোলার পাম্প চালানোর কাজে লাগে। উভয় ধরনের হাওয়া-কলই 1 থেকে 10 অশ্বশক্তি পর্যন্ত ক্ষমতার হতে পারে। এই শক্তিকে সঞ্চয় করে রাখার ব্যবস্থাও হতে পারে নানাভাবে—তামা ও অ্যাসিডের ব্যাটারিতে, সংবদ্ধ (compressed) বায়ুতে, thermic fluid-এ ডুবন্ত হিটারের (immersion heater) মাধ্যমে।

জৈব শক্তি

এটিই দেশের সর্বাধিক ব্যবহৃত একক শক্তি উৎস। এখন দেশের শতকরা 45 ভাগ শক্তিচাহিদা মেটে এই উৎস থেকে—যদিও তা অত্যন্ত অবৈজ্ঞানিক, অপরিশীলিত ও অস্বাস্থ্যকর পদ্ধতিতে। প্রচুর ব্যয়ে মাটিতে গর্ত খোঁড়া হয়, ধাতুর ঢাকনা লাগানো হয়। কিন্তু গোটা জৈব-রাসায়নিক প্রক্রিয়া, তাপমাত্রার প্রভাব, সর পড়ার (scum formation) সমস্যা ইত্যাদি বিষয়ে লক্ষ্য না দেয়ার ফলে এক সময়ে গ্যাস উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। এছাড়া জৈবপদার্থকে নাড়ানো, সেটির ক্ষয় করার ক্ষমতা (corrosive nature) এবং গ্যাস ধারণ সময় (hydraulic retention time) ইত্যাদি বিষয়কে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়। হয়তো গ্রামের প্রকল্পকে অতো নিখুঁত করার দরকার আছে বলে মনে করা হয় না!

জৈব গ্যাস প্রকল্পের খুঁটিনাটি

প্রস্তাবিত প্রকল্পটি তৈরী করা হয় ত্রিস্তর রিইনফোর্সড প্লাস্টিক এবং একস্তর উত্তম সৌরতাপ-শোষক (solar black body absorber) দিয়ে যেটি মিথেন উৎপাদনকারী ব্যাকটিরিয়াগুলির ক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে। এর ফলে জৈব পদার্থগুলির গ্যাস ধারণ সময় এক-তৃতীয়াংশে নেমে আসে। এই ব্যবস্থায় শুধুমাত্র রাসায়নিকভাবে নিষ্ক্রিয় প্লাস্টিকই ব্যবহার করা হয় ফলে পাত্রের ক্ষয়ের কোনো আশঙ্কা থাকে না। এ সত্ত্বেও এ ধরনের গ্যাস প্রকল্পের খরচ প্রথাগত (dug pit type) প্রকল্পের খরচের এক দশমাংশ।

এই গ্যাসকে থলিতে সংগ্রহ করে নিরাপদে বাড়িতে বাড়িতে রান্নার জন্য সরবরাহ করা সম্ভব।

সমন্বিত শক্তি

তিনটি শক্তির প্রযুক্তিকে আরো পরিশীলিত করে তাদের সমন্বয়ে একটি যৌথ শক্তিভাণ্ডার (thermal pool) গড়ে তোলা সম্ভব এবং তা থেকে প্রয়োজন অনুসারে বাষ্পচালিত বা গরম বায়ুচালিত টারবাইন এর মাধ্যমে শক্তি সংগ্রহ করা যাবে। এর অভিনবত্ব হলো এটি শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে একই সঙ্গে তাপশক্তি, যান্ত্রিক শক্তি ও তড়িৎশক্তি সরবরাহ করতে সক্ষম—শক্তির কোনোরকম অপচয় ছাড়াই।

যেহেতু এই সুসংহত শক্তিপ্রকল্প শুধুমাত্র মুক্ত শক্তি সরবরাহ করে সেজন্য এটি গ্রামাঞ্চলের পক্ষেই উপযোগী—এই কারণে গ্রামাঞ্চলে নতুন ধরনের শিল্পায়ণ শুরু হতে পারে। এমন কি প্রথাগত শক্তি সরবরাহের ওপর নির্ভরশীল শিল্পগুলিতে কিছু বদল ঘটিয়ে এই বিকল্প শক্তি সরবরাহে চালানো সম্ভব—সেক্ষেত্রে তা আরো লাভজনক ও দক্ষ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

গ্রামাঞ্চলে মুক্ত শক্তির যথেষ্ট সরবরাহকে নিশ্চিত করা গেলে সেখানকার উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডকে আরো সুষ্ঠু ও গতিশীলভাবে পরিচালিত করা সম্ভব হবে। আর যেহেতু আমাদের দেশের বেশীরভাগ মানুষই শহরের পরিধির বাইরে বসবাস করেন এবং বিজ্ঞানের সুফল থেকে অনেকাংশেই বঞ্চিত, তাই তাঁদের জীবনযাত্রার গুণগত উৎকর্ষ ঘটাতে এমন ধরনের প্রযুক্তি চাই যা আমাদের দেশের পরিস্থিতির উপযোগী। শুধুমাত্র বিদেশী আধুনিক প্রযুক্তিকে আমদানি বা অনুকরণ করে তা সম্ভব নয়। □

ভাষান্তর ও সম্পাদনা : কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রতিবেদন

কোলাঘাট—আগামী দিনের ব্যাগেল

নিশীথ চৌধুরী

'প্রখর দহন অতি দীর্ঘ দগ্ধ দিন' 5ই আগস্ট, রবিবার। পরপর কয়েক দিন বৃষ্টির পর আকাশ ভরা প্রখর সূর্যকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম সেদিন। গন্তব্য—কোলাঘাট তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্প (Kolaghat Thermal Power Project সংক্ষেপে—K T P P)। সফরসঙ্গী, শ্রীকান্ত।

হাওড়া-খড়্গপুর লোকালে মেচেদায় নেমে হাঁটি হাঁটি পায়ে এগিয়ে চললাম KTPP-র দিকে। কাছাকাছি গিয়ে জাতীয় সড়ক-এর উপর বিজয় গাড়ুই-এর চা-এর দোকানে বসে একটু জিরিয়ে নিচ্ছিলাম। চা-এর পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে তাকিয়েছিলাম KTPP-র সাদা-কালো চিমনিগুলোর দিকে। দুটো চিমনি দিয়ে তখন বেরিয়ে চলেছে অনর্গল কালো ধোঁয়া। বাকী চারটি চিমনি অপলক তাকিয়ে দেখছে সেই কালো ধোঁয়ার শোভাযাত্রা। 'দূরে কোথায়—দূরে দূরে'। বিজয়বাবু বললেন—'এত কাছে দোকানে ছাই পড়ে না খুব একটা, তবে পাঁচ মাইল দূরে বাড়িতে একটু হাওয়া দিলেই ছাই-এর উৎপাত খুব। উৎপাত কেমন তা বুঝিয়ে বললেন পানচাষী পঞ্চানন ঘোড়া। বাড়ি দেড়িয়াচক। "কি আর করা যাবে। সরকারি ব্যাপার, এতো আর বন্ধ হবার নয়। চিমনির ধোঁয়ার সঙ্গে বের হচ্ছে পাউডারের মতো কার্বন গুঁড়ো। পানের পাতায় কালো ছোপ ছোপ পড়ছে, ধুলেও যায়না। দাম কমছে, ব্যবসা মার খাচ্ছে। চাষীদের কথা কে ভাবে বলুন ?"

"শুধু পান নয়, ক্ষতি হচ্ছে ফুল চাষেও। ফুল গাছ কালো হয়ে যাচ্ছে। ফুলের গায়ে কালো কালো ছোপ। জলে ধুয়ে রঙ দিচ্ছি, তবু কালো ছোপ ওঠে না, দাগী ফুল জলের দরে বিকোয়।" —বললেন ফুলচাষী নগেন বেরা।

জাতীয় সড়ক ধরে হাঁটতে হাঁটতে ভাবছিলাম ব্যাণ্ডেল তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কথা। মোট 5টি ইউনিটের সামগ্রিক উৎপাদন ক্ষমতা 500 মেগাওয়াটের কিছু কম। প্রতিদিন 4,000 টন কয়লা পোড়ে ওখানে। চিমনি দিয়ে নির্গত ছাই-এর পরিমাণ 10 টন। বিপুল পরিমাণ এই ছাই পার্শ্ববর্তী, চন্দ্রহাটি, ত্রিবেণী প্রভৃতি স্থানে ছড়িয়ে পড়ছে। 40-50 হাজার মানুষ বিপন্ন। ছাই নয় শুধু, আছে সালফার ডাই-অক্সাইড গ্যাস। আছে ভয়ংকর মাপের শব্দ-দূষণ। প্রতিদিন 10 ঘণ্টা করে 120-130 ডেসিবল বিকট শব্দ। বর্জ্য-পদার্থ হিসাবে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে উত্তপ্ত অ্যাসিডমিশ্রিত জল গঙ্গাতে।

সারা এলাকাতে ফুসফুসের রোগ, চর্মরোগ বেড়ে চলেছে শত্রুর অপরাধে। সংগঠিত হয়েছেন এলাকার মানুষ—সেই 1984 থেকে। 1989 থেকে দৃঢ়তর বুনিয়াদ তৈরী সংগঠনের। 'ছাই-পীড়িত নাগরিক কমিটি' পরিবেশ আন্দোলনের নয়া ইতিহাস রচনাতে করেছেন আত্মনিয়োগ। হাজার হাজার বিঘা কৃষি জমি অনুর্বর হয়ে যাচ্ছে, মানুষের স্বাস্থ্য হচ্ছে ক্ষীণ। প্রতিকার নেই। আছে প্রতিশ্রুতি। আছে পরিবেশ রক্ষার জন্য সংগ্রামে অবতীর্ণ সরকারী আমলা ও মন্ত্রীদের হাতে বিশাল মাপের গদা—যে সব গদাতে আছে তুলা—হ্যাঁ তুলার গদা হাতে নিয়েই লড়েন এই সব নয়া দুর্যোধন-দুঃশাসনরা।

চমক ভাঙলো—সফর সঙ্গী শ্রীকান্তের ডাকে। দুপাশের দিকে রাখলাম

সন্ধানী চোখ। দুপাশে অপরূপ সবুজের সমারোহ দেখে অবাক হলাম। ভুল ভাঙলো একটু পরেই। গাছের পাতায় অল্প-স্বল্প কালো ছোপ। পথচারী রবীন পাল বললেন—"বৃষ্টির আগে এলে দেখতে পেতেন গাছের পাতায় পাতায় কেমন কালো ছাই-এর বাহার। এখন বৃষ্টির জলে সব ধুয়ে গিয়ে মিশেছে খালে বিলে নদী নালায়। এর সাথে আছে KTPP-র নোংরা দূষিত জল। সব মিলেমিশে একাকার। জমির ফসল কমছে। মাছের ফলন কমছে। আর এসব নিয়ে আমরা দিব্যি বেঁচে ব'র্তে আছি।"

রবীনবাবুর কথায় কোনও গুরুত্ব দিলেননা জনৈক রাজনৈতিক কর্মী। "আপনাদের কি খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই? ওসব দূষণ-ফুষণ বাজে কথা। মাঝে মধ্যে একটু আধটু ছাই-টাই ওড়ে, এই যা। তাই নিয়ে এত হই চই কিসের?"

অসুস্থ শরীরেও হই চই অবশ্য একটু বেশীই করছিলেন শিক্ষিকা রীণা বন্দোপাধ্যায়। "ছাই-এর জ্বালায় প্রাণ যায় যায়। ঘর-দোর নোংরা হচ্ছে। বাসন-কোসনে কালি পড়ছে। কাপড়-চোপড় কেচে হাত ব্যথা হ'য়ে গেল।"

রীণাদির বাড়িতে আর এক রাউণ্ড চা শেষ ক'রে এবার একটা রিক্‌শা ধরলাম। সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে। রিক্‌শাচালক একটা রঙিন চশমা বের ক'রে চোখে দিলেন। আমি অবাক হলাম। রিক্‌শাচালক মুচকি হাসলেন।

রূপনারায়নের কুল ঘেসে আমাদের রিক্‌শা এগিয়ে চলেছে। তিরতির নদীর হাওয়া গায়ে এসে লাগছে। মৃদু চাঁদের আলোয় জীবনানন্দের কয়েকটা লাইন মনের কিনারে ঘুরে ফিরে এলো। আনমনে কখন যে চোখের চশমটা খুলে রুমাল দিয়ে মুছতে শুরু করেছি—খেয়াল করিনি। হঠাৎ চোখে এসে কাঁটার মতো বিঁধলো KTPP-র ছাই। এতক্ষণে রিক্‌শাচালকের মুচকি হাসির অর্থ বুঝতে পারলাম। আশে পাশে তাকিয়ে দেখি অনেকের চোখেই লাল নীল সাদা কালো চশমা। আজ কি ছাই বেশী উড়ছে? হয়তো বা। ধন্য KTPP ধন্য তোমার মহিমা।

উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম কোলাঘাট ও সন্নিহিত এলাকায় KTPP-র কল্যাণে পরিবেশ দূষণের মাত্রা বাড়ছে। চিমনি থেকে বেরনো কার্বন যাতে গুঁড়ো বাতাসে ছড়িয়ে পড়তে না পারে সেই জন্য KTPP কর্তৃপক্ষ একটি ইলেকট্রো-স্ট্যাটিক-প্রেসিপিটেটর যন্ত্র এনেছেন, যেটি বর্তমানে বিকল। সহজ সমাধানের পথ হিসাবে পুরনো চিমনিগুলোর চেয়ে নতুন চিমনিগুলোর উচ্চতা বাড়িয়ে দিয়েছেন। ফলে KTPP-র ছাই উড়ে গিয়ে পড়বে দূরে—আরও দূরে। আরও ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর অঞ্চল দূষিত হবে। অথচ কিছু কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সাধারণ মানুষের মধ্যে পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধে আন্দোলন এখনও তেমন দানা বেঁধে ওঠেনি। 'কোলা সাইন্স হবি সেন্টার' সহ স্থানীয় কিছু সংগঠন বিক্ষিপ্ত ভাবে কিছু কিছু 'পরিবেশ আন্দোলন' করলেও রাজনৈতিক দলগুলি এবিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন, যদিও একথা বলাই বাহুল্য, কোলাঘাটে পরিবেশ দূষণের মাত্রা এখনই চরম বিপদসীমা ছাড়িয়ে না গেলেও অচিরেই তা যে ভয়ঙ্কর হ'য়ে উঠবে সে বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। রাজ্য পরিবেশ দপ্তর KTPP কর্তৃপক্ষ এ বিষয় নতুন ক'রে কিছু ভাবছেন কি? নয়তো কোলাঘাট, আগামী দিনের ব্যাণ্ডেল হ'য়ে উঠবে আজ নয় কাল। □

সমুদ্র দূষণ, আমরা ও "নীল বিপ্লব"

বিশুদ্ধানন্দ পুরকাইত

ক্যাপ্টেন নিমোর জলযান থেকে

"বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করার পর ভয়ংকর দৃশ্য দেখে চমকে উঠলাম। ভেসে আসছে অসংখ্য মানুষের মৃতদেহ। লোভী শকুনদের উদরপূর্তির পরেও উদ্‌বৃত্ত এই সব ভারতীয় গ্রামীণ মানুষজনের মৃতদেহ উন্মুক্ত সাগরে বহন করে আনছে গঙ্গা নদী।" বিগত শতাব্দীর প্রায় মধ্য ভাগে এই কথা লিখেছেন কল্পবিজ্ঞানী জুল ভার্ণ তাঁর 'সাগরের তলায় 20,000 লীগ' বইতে। এখন শেষ হতে চলেছে বিংশ শতাব্দী। ইতিমধ্যে অনেক জল গড়িয়েছে গঙ্গা দিয়ে। শুধু গঙ্গা কেন? জল গড়িয়েছে এ বিশ্বের সব নদী দিয়ে। সে জল গিয়ে পড়েছে সাগরে। সাথে নিয়ে গিয়েছে এমন সব দ্রব্য-সম্ভার যা সমুদ্র-পরিবেশে বেমানান। বিপন্ন হয়েছে রত্নাকর। খুব ধীরে ঘটে চলেছে যদিও, আজ তা দুশ্চিন্তার বিষয় হয়েই দাঁড়িয়েছে।

বারিমণ্ডল—সম্পদের অফুরান ভাণ্ডার

হ্রদ, সাগর, মহাসাগর ও উপসাগর মিলিয়ে সৃষ্টি হয়েছে পৃথিবীর বারিমণ্ডল যা ভূ-পৃষ্ঠের প্রায় 71·4% ভাগ অধিকার করে আছে। সারা বারিমণ্ডলের সিংহভাগ (70·8%) দখল করে আছে 4টি মহাসাগর। প্রশান্ত মহাসাগর, আট্‌ল্যান্টিক মহাসাগর, ভারত মহাসাগর, সুমেরু মহাসাগর। আর এদের পরে আছে ছোট অংশীদারেরা। অসংখ্য সাগর আর উপসাগর আর হ্রদ।

রত্নাকর বলা হয় সমুদ্রকে। অকৃপণ ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার নিয়ে সমুদ্র অপেক্ষা করে আছে আমাদের জন্য। আছে বিশাল খাদ্যের আয়োজন। আছে নানা রকম ধাতু। আছে বিপুল পেট্রোলিয়ামের ভাণ্ডার। সমুদ্র দিয়েছে জলপরিবহনের সুযোগ। অসীম বৈচিত্র্যময় জলজ প্রাণী ও

উদ্ভিদের বাসস্থান সমুদ্র। চেষ্টা চলছে সমুদ্র-তাপ থেকে শক্তি সংগ্রহের। জোয়ারভাটা থেকে শক্তি আহরণের উপায় অন্বেষণ চলছে। তরঙ্গের মাঝে লুকিয়ে থাকা যে শক্তি তাও মানবকল্যাণে ব্যবহারের চলছে প্রচেষ্টা। আগামী দিনে যখন দুনিয়াব্যাপী জল-সংকট দেখা দেবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে—তখন হয়তো ঐ বিশাল জলধি আমাদের বাঁচাবে। মানুষের বুদ্ধি লবণ পরিহার করে সমুদ্রের জলকে সুপেয় করে তুলবে—এমন সম্ভাবনা ইতিমধ্যেই হয়েছে উজ্জ্বল। তাছাড়া পৃথিবীর আবহাওয়ার গতিপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রণেও মুখ্যভূমিকা এই সমুদ্রেরই।

রত্নাকর পরিণত হচ্ছে সারা বিশ্বের আবর্জনা নিক্ষেপের পাত্রে

দূষণের বলি হয়েছে উত্তর সাগর। একটি সমীক্ষা অনুযায়ী ইউরোপের শিল্পোন্নত দেশ ব্রিটেন, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড জার্মানী ও ডেনমার্কের নদীগুলি উত্তর সাগরে নিক্ষেপ করছে—

নাইট্রোজেন	50 000 টন
ফসফরাস	46 000 ,,
পারদ	110 ,,
ক্যাডমিয়াম	100 ,,
সীসা	21 800 ,,
দস্তা	107 000 ,,

শুধু উত্তর সাগর কেন? দূষিত হয়ে পড়েছে এ বিশ্বের সমগ্র বারিমণ্ডল।

সপ্ত পয়ঃপ্রণালী

সেণ্ট লরেন্স ঃ মনট্রিল শহর একাই প্রতিদিন 1 বিলিয়ন লিটার আবর্জনা ছাড়ে।

মিসিসিপি ঃ বছরে 98 মিলিয়ন পাউণ্ড বিষাক্ত রাসায়নিক বস্তু বহন করে।

টেমস ঃ মাত্রাধিক দূষণ হয়েছিল। সৎ ও সুদীর্ঘ প্রচেষ্টা ফিরিয়ে এনেছে স্যামন মাছ।

রাইন ঃ দূষণের মাত্রা সর্বাধিক। ইউরোপের নর্দমা আখ্যা পেয়েছে।

ভোলগা ঃ জলের এক দশমাংশই শিল্প আবর্জনা।

গঙ্গা ঃ অসংখ্য কারখানার বর্জ্য পদার্থ ও বড় বড় শহরের অপরিশোধিত আবর্জনায় দূষিত।

ইয়াং সিকিয়াং ঃ দৈনিক আবর্জনা নিক্ষেপ 16 টন।

ভয়াবহ এই উপহার নদীরা দিচ্ছে সমুদ্রকে।

কতিপয় কেতাবি পরিত্রাণ প্রচেষ্টা

কিন্তু সারা বিশ্বের প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় সমুদ্রের তো বিরাট অবদান আছে। সে কথার প্রতিধ্বনি পাই 1972 সালের স্টকহোম ঘোষণার প্রকৃতি সংরক্ষণের জন্য গৃহীত সপ্তম নীতিতে। সেখানে বলা আছে—"সকল রাষ্ট্রকে সাগর দূষণের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য সব রকম ব্যবস্থা এমনভাবে নিতে হবে যাতে সামুদ্রিক প্রাণী, অন্যান্য জীবজন্তু ও সম্পদাবলীর উৎস সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত না হয়; বিঘ্নিত না হয় মানুষের স্বাস্থ্য ও আইন সঙ্গত ব্যবহার ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা গ্রহণ।" কিন্তু স্টকহোম ঘোষণার সেই পবিত্র কথাগুলি কতটুকু পালিত হচ্ছে?

সারা বিশ্বের এক শতেরও বেশী দেশের প্রতিনিধিরা মিলে প্রণয়ন করেছিলেন সমুদ্র বিষয়ে এক আইন। নাম তার United Nations Convention on Law of the Seas-III সংক্ষেপে UNCLOS-III যাতে আছে 320টি ধারা এবং 7টি সংযোজনী। এটাই ছিল এ জাতীয় তৃতীয় অধিবেশন। এই আইনটিতে আছে সমুদ্র পরিবেশের সংরক্ষণের বিষয়টিও। বলা আছে প্রত্যেক রাষ্ট্র তার উপকূলবর্তী সমুদ্র-অঞ্চলের পরিবেশ রাখবে সুরক্ষিত এবং বিশ্ব পরিবেশ সংরক্ষণে অন্যান্য রাষ্ট্রকে করবে সহযোগিতা। আজকের সমুদ্রের পরিবেশ দেখলে মনে হয় UNCLOS-III একটা তরল পরিহাস।

পারমাণবিক আবর্জনাগুলির কি গতি হবে? বিষম চিন্তিত 62টি দেশের সরকার লণ্ডনে আলোচনায় বসে 26শে জুলাই 1988 এলেন একটি চুক্তিতে। চূড়ান্ত লক্ষ্য পারমাণবিক দূষণ থেকে সমুদ্রকে মুক্ত রাখা। কিন্তু কতটুকু কার্যকরী হয়েছে এই চুক্তি? অবশ্য ভারত সরকার এ চুক্তিতে স্বাক্ষর দেন নি।

ভারতের সংবিধানে অনেক পবিত্র ধারার মাঝে দৃষ্টি আকর্ষণ করে 48A ধারাখানি। প্রকৃতি সংরক্ষণে রাষ্ট্রের নির্দেশকনীতি লিখিত আছে এই ধারাতে। আর আছে 51A (g) উপধারা। সেখানে বলা আছে নাগরিকদের প্রকৃতি সংরক্ষণে তথা পরিবেশ রক্ষার্থে কী মৌলিক কর্তব্য পালন করতে হবে। অর্থাৎ প্রকৃতি সংরক্ষণে রাষ্ট্রের ও নাগরিকের উভয়ের ভূমিকা আছে ভারতীয় সংবিধানে। কিন্তু বাস্তবের চিত্র হতাশাব্যঞ্জক।

সমুদ্র-সম্পদ আহরণে ভারতের নবীন উদ্যোগ

ভারতের সমুদ্র-সান্নিধ্য ঈর্ষার উদ্রেক করতে পারে অন্যান্য অনেক দেশের। সুদীর্ঘ উপকূল রেখা আছে আমাদের। মোট পরিমাণ 7000 কিঃ মিঃ। আমাদের মোট 8টি রাজ্যই সমুদ্রের পাশে। গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, কেরালা, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গ। আছে 2টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল গোয়া ও পণ্ডিচেরী—সমুদ্র তটরেখার সমীপে। আমাদের আছে লাক্ষা দ্বীপ। আছে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ। বিপুল সংখ্যক দ্বীপ—মোট 1280টি। UNCLOS-III অনুসারে আমাদের অধিকার-সীমা উপকূল থেকে 12 নটিক্যাল মাইল বিস্তৃত। তাছাড়া আছে এই 12 নটিক্যাল মাইলের পরে আরো 188 নটিক্যাল মাইল প্রশস্ত একান্ত অর্থনৈতিক অঞ্চল যেখানে আমরা অর্থনৈতিক কাজকর্ম চালাতে পারি। অর্থাৎ সংলগ্ন সমুদ্রের আরব সাগর, ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগর) এক বিশাল অঞ্চল আমাদের দখলে। মোট

পরিমাণ তার 2 মিলিয়ন বর্গ কিঃ মিঃ। ভারতের মূল ভূখণ্ডের 2/3 অংশের সমান এই সুবিশাল জলভাগ—এই রত্নাকর আমাদের পরিত্রাতা হতে পারে। দেশের সমুদ্র-বিজ্ঞানীদের আশা তাই। বাস্তবিক সমুদ্র-সম্পদ আহরণের প্রচেষ্টায় মাত্রা যোগ হয়েছে। ভারত সরকার নতুন এক বিভাগের সূচনা করেছেন। সমুদ্র উন্নয়ন বিভাগ। লোকসভা ও রাজ্যসভাতে গৃহীত হয়েছে আমাদের সমুদ্রনীতি 1982 সালে। স্থাপিত হয়েছে National Institute of Oceanography গোয়ার সমুদ্র-তীরে। তা ছাড়া গবেষণা চলছে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে। স্থাপিত হয়েছে অনেক মৎস্য গবেষণা কেন্দ্র। জাতীয় গবেষণাগার গুলিতে এ বিষয়ে কাজ শুরু হয়েছে। IIT গুলিও এ বিষয়ে দৃষ্টিপাত করেছেন। যে সব ক্ষেত্রের উপরে যত্নবান হয়েছেন তাঁরা, সেগুলি হচ্ছে—

(1) পদার্থবিদ্যা বিষয়ক সমুদ্রবিজ্ঞান (2) রাসায়নিক সমুদ্রবিজ্ঞান (3) জৈব সমুদ্রবিজ্ঞান (4) ভৌগলিক ও ভূতাত্ত্বিক সমুদ্রবিজ্ঞান (5) সমুদ্রে ব্যবহার্য যন্ত্রাদির উদ্ভাবন (6) সামুদ্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং (7) সমুদ্র-দূষণ নিয়ন্ত্রণ (8) সমুদ্র বিষয়ক তথ্যের সদ্ব্যবহার। সংঘটিত হতে চলেছে "নীল-বিপ্লব" আমাদের দেশে। আমরা আশাবাদী। এই নয়া কর্মোদ্যোগ সফলতার উজ্জ্বল আলোকে স্নাত হবে। কিন্তু 7নং ক্ষেত্র সমুদ্র-দূষণ নিয়ন্ত্রণ যদি শুধু অঙ্গীকার গ্রহণের পর্বে সীমাবদ্ধ থেকে যায় তাহলে অবশিষ্ট ক্ষেত্রগুলি নিরর্থক হয়ে পড়তে বাধ্য। ভারতের সমুদ্র-দূষণ ইতিমধ্যেই বিকট পরিস্থিতির সম্মুখীন।

সমুদ্র-দূষণের এসব দায় কি আমরা উপেক্ষা করতে পারি

1 আবর্জনা-জনিত সমুদ্র-দূষণ

(ক) পৌর আবর্জনা

আমাদের দেশের নদীগুলি তাদের অববাহিকাতে অবস্থিত শহরের পরিত্যক্ত আবর্জনা নিয়ে জমা করছে সাগরে। অধিকাংশ পুরসভা আবর্জনা অপরিশোধিত অবস্থাতেই ফেলে দেন। নদীবাহিত হয়ে সাগরে চলে যায় তেল, রাস্তার ময়লাসহ অন্যান্য আবর্জনা। পরিশোধন ব্যবস্থা গ্রহণের পরেও থেকে যায় ফসফেট নাইট্রেট ইত্যাদি। বছরে বছরে সাগরে জমা হচ্ছে 3 7 ঘন কিঃ মিঃ আবর্জনা। গঙ্গা নদীর 2525 কিঃ মিঃ যাত্রাপথে অসংখ্য গ্রাম আর 100 শহর। এর মধ্যে 27টি শহরের প্রত্যেকের জনসংখ্যা একলক্ষেরও বেশী। এর থেকে প্রতিদিন গড়ে নদীতে পড়ছে 120 কোটি লিটার ময়লা জল। সমগ্র ভারতের নদীগুলির মিলিত প্রচেষ্টায় যে বিপুল পরিমাণ জৈব আবর্জনা সমুদ্রে চলে যাচ্ছে—তা টান ধরাচ্ছে সমুদ্র জলের অক্সিজেনের ভাণ্ডারে। নদীবাহিত আবর্জনার সাথে যুক্ত হচ্ছে উপকূলের অধিবাসীদের পরিত্যাগ করা বাৎসরিক 2·5 মিলিয়ন টন কঠিন আবর্জনা। জৈব আবর্জনার দুটি শ্রেণী—সহজে জৈব অবনয়নশীল ও ধীরে জৈব অবনয়নশীল। সহজে হোক আর ধীরে হোক জৈব অবনয়নকালে জলের দ্রবীভূত অক্সিজেন প্রচুর খরচ হয়ে যায়। ফলে সামুদ্রিক প্রাণীদের শ্বাসযন্ত্র হয় বিপর্যস্ত। ব্যাপক হারে মৃত্যু ঘটে যায় তাদের।

(খ) শিল্প আবর্জনা

কৃষি প্রধান দেশ আমাদের। শিল্পে স্বয়ম্ভর হবার লক্ষ্যে মনোযোগ দেওয়া হয়েছে স্বাধীনতার পরবর্তীকালে। গড়ে উঠেছে নানা ধরনের শিল্প-উদ্যোগ। কিন্তু মুনাফাভিত্তিক পরিচালনা দূষণ নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে উদাসীন। শিল্প-আবর্জনা তাই বিকট সমস্যার সৃষ্টি করেছে। আমাদের প্রধান নদীগুলি যেমন গঙ্গা, যমুনা, দামোদর, হুগলী, পেরিয়ার, মহানদী, শোন, গোদাবরী, চম্বল, কাবেরী, গোমতি, রুমিকুল্লা, তুঙ্গভদ্রা ইত্যাদি তাদের দুই পাশে অবস্থিত অসংখ্য কারখানার বর্জ্য পদার্থ নিয়ে ফেলে দিচ্ছে সাগরে। বৎসরে 0·37 ঘন কিঃ মিঃ পরিমাণ শিল্প আবর্জনা সমুদ্র-দূষণের এক বিশাল কারণ। একমাত্র গঙ্গা নদীর তীরে গড়ে ওঠা 1·2টি বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প-প্রতিষ্ঠান এবং 64টি ট্যানারি অভিযুক্ত হয়েছে সুপ্রীম কোর্টে জলদূষণের জন্য। উত্তরপ্রদেশে প্রবেশ করার পরে হরিদ্বার থেকে গঙ্গার দূষণের শুরু এবং হলদিয়া পর্যন্ত নেই তার বিরতি। সমুদ্রে চলে যাচ্ছে আর্সেনিক। যাচ্ছে পারদ। যাচ্ছে প্রচুর অ্যাসেটালডিহাইড। চিংড়ি ও পমফ্রেট মাছের শরীরে পারদের উপস্থিতি ধরা পড়েছে। রান্নার পরেও এই পারদ অবিকৃত থাকে। বছরে বছরে সাগরে বাহিত ডিটারজেন্টের পরিমাণ বিস্ময়কর—30,000 টন। সাংঘাতিক ব্যাপার হল এই পদার্থটি দীর্ঘদিন অবিকৃত থাকে—এর অবনয়ন হয় না। নির্মাণ কার্য ও ড্রেজার যন্ত্র চালনার ফলে প্রচুর ভাসমান মৃত্তিকাকণা চলে যায় সাগরে। চলে যায় ভাসমান অন্যান্য কঠিন পদার্থের কণা, চক-পাউডার, চিনামাটি, টিটানিয়াম-ডাই-অক্সাইড ইত্যাদি। এরা সামুদ্রিক মাছের কানকোতে যায় আটকে। এবং নানারকম শারীরবৃত্তীয় বিপত্তি ঘটায়। ডেকে আনে মৃত্যু। সাগরের তলদেশ খুঁড়ে পেট্রোলিয়াম বের করে আনা হচ্ছে। বিনিময়ে মানুষ সাগরে ছড়িয়ে দিচ্ছে উত্তোলিত কর্দমের ভাসমান কণা ও অপরিশোধিত তেল। বাণিজ্যিক ও বিনোদনের কাজে নিযুক্ত জাহাজ থেকে ছাড়া হচ্ছে অশোধিত ময়লা, আর পোড়া তেল। তৈলবাহী জাহাজ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে তেল। ভাসছে সাগরের জলে। উপকূল অঞ্চলের তাপ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলি সমুদ্রের তাপ-দূষণ ঘটাচ্ছে। ছাই উড়ছে। সেই ছাইতে আছে বিষাক্ত সব পদার্থ—আর্সেনিক, ক্যাডমিয়াম, ক্রোমিয়াম, পারদ, সীসা, ম্যাঙ্গানীজ, ভ্যানাডিয়াম, ক্লোরিন, ব্রোমিন ইত্যাদি। অ্যাসিড-বৃষ্টির সৃষ্টি করছে সালফার-ডাই-অক্সাইড গ্যাস। আর বিষাক্ত মৌল পদার্থগুলি প্রবেশ করছে খাদ্য-শৃংখলে। মনে রাখা দরকার, সমুদ্রের বাস্তুতন্ত্র স্থলভাগের তুলনায় অনেক বেশী ভঙ্গুর। খাদ্য শৃঙ্খলের দৈর্ঘ্যও কম, উৎপাদকরা (এক্ষেত্রে Phyto-plankton) অনেক বেশী সমসত্ত্ব। তারা যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় স্বভাবতই প্রথম আর দ্বিতীয় শ্রেণীর খাদকরা এর থেকে রেহাই পাবে না। নোংরা জলের সাথে বাহিত হয়ে স্যালমোনেলা নামের বিষাক্ত জীবাণু ক্ষতি করছে

সামুদ্রিক মাছের। আবর্জনার সাথে সমুদ্রে পড়ছে নানা রকম ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া। শামুক ও ঝিনুকের শরীরে তারা প্রবেশ করছে। হেপাটাইটিস ও আন্ত্রিক রোগের কারণ সৃষ্টি করছে। অথচ এ সব নিবারণের জন্য অনেক আইন প্রণীত হয়েছে আমাদের দেশে। কিন্তু শিল্প-আবর্জনা জাত সমুদ্র-দূষণ সমানে চলেছে। তাইতো ভারতের কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের ভূতপূর্ব চেয়ারম্যান নিলয় চৌধুরী বলেন, আমাদের পরিবেশ রক্ষাকারী আইনগুলি কাগুজে বাঘ!

2. পারমাণবিক আবর্জনা জনিত সমুদ্র দূষণ

স্বাভাবিকভাবে সমুদ্র-জলে আছে আলফা বিটা ও গামা রশ্মি। প্রতি লিটার জলে প্রায় 13 বেকারেল। সমুদ্রের তলদেশে সঞ্চিত দ্রব্যে এর পরিমাণ 500 বেকারেল থেকেও বেশি। এর সাথে যুক্ত হচ্ছে মানুষের সৃষ্টি করা তেজস্ক্রিয়তা। সমুদ্রের তলদেশে পারমাণবিক আবর্জনা জমা করা হচ্ছে। 1945 থেকে আজ পর্যন্ত সাগরের বুকে জমা হয়েছে 9টি পারমাণবিক চুল্লী আর 50টি পারমাণবিক অস্ত্র। বিশ্বের বৃহৎ 5টি শক্তিধরের মোট 544টি জাহাজ ঘুরে বেড়াচ্ছে সাগরে যাদের মধ্যেই আছে পরমাণু চুল্লী। 1976 সাল থেকে 1985 সাল পর্যন্ত সাগরের বুকে জমা করা হয়েছে মোট 45000 টন তেজস্ক্রিয় আবর্জনা। আমাদের নিজস্ব পরমাণু চুল্লীগুলির আবর্জনার পরিমাণ কম কি? প্রাথমিক কঠিন আবর্জনা, কম মাত্রার আবর্জনা, মধ্যবর্তী মাত্রার আবর্জনা ও উচ্চ মাত্রার আবর্জনার মিলিত পরিমাণ ছিল 1982 সালে 5200 ঘন মিটার যা 2000 সালে 115700 ঘন মিটারে দাঁড়াবে। যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দূষিত করে চলবে আমাদের সমুদ্র অঞ্চলকে। ফলে খাদ্যচক্রের মধ্যে তেজস্ক্রিয়তার অনুপ্রবেশ ঘটবে এবং সমুদ্রের ভোজ্য জীবন-সম্পদের মাধ্যমে তা প্রবেশ করতে বাধ্য মানুষের শরীরে। পরমাণু চুল্লী থেকে তেজস্ক্রিয় দূষণ ছাড়াও সাংঘাতিক মাপের তাপ-দূষণ হয়। তাই পরমাণু চুল্লী স্থাপনের সময় বৃহৎ জলের উৎসের নিকটবর্তী স্থান বাছাই করা হয় এবং উৎপাদিত তাপের প্রায় 70% ভাগ ছেড়ে দেওয়া হয় জলের উৎসে। ফলে জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদের কাছে তা হয়ে দাঁড়ায় বিপজ্জনক। সমুদ্রের জলে সঞ্চিত তাপের ভারসাম্য নষ্ট করে তা আবহাওয়ার ক্ষেত্রে সুদূর প্রসারী প্রভাব ডেকে আনতে পারে।

3. কৃষিক্ষেত্র বিধৌত দ্রব্যে সমুদ্র-দূষণ

দেশে 'সবুজ বিপ্লব' হয়েছে। বেড়েছে উচ্চফলনশীল শস্য-চাষ। ক্রমাগত প্রচারে ভারতীয় চাষীরা জৈব সারে প্রাধান্য না দিয়ে অজৈব রাসায়নিক সার, কীটনাশক ও আগাছানাশক ব্যবহারে প্ররোচিত হয়েছে ভীষণভাবে। একমাত্র 1986-87 সালেই মোট 9500 000 টন নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশিয়াম ঘটিত সার ব্যবহার করা হয়েছে। জমিতে প্রয়োগ করা ঐ সব রাসায়নিক বস্তুর বিপুল একটা অংশ থেকে যায় অব্যবহৃত। ভূগর্ভ জলকে দূষিত করা ছাড়াও এরা নদীবাহিত হয়ে সমুদ্র দূষণের কারণ ঘটায়। প্রতিবছর প্রায় 77420 টন কীটনাশক ও আগাছা-নাশক ব্যবহার করা হচ্ছে। 1976-80 সালে এই সব বিষ উৎপাদিত হয়েছে মোট 250 000 টন। এর অন্তত 25% ভাগ অবশেষে সাগরে গিয়ে জমেছে। প্রধানত দু জাতের কীটনাশক আছে। অরগানোক্লোরিন এবং অরগানোফসফেট। ডি ডি টি আর বি এইচ সি পড়ে প্রথম শ্রেণীতে। এরা সহজে অবনয়িত হয় না এবং সমুদ্রযাত্রার পর সামুদ্রিক প্রাণীদের টিস্যুতে থেকে যায়। দ্বিতীয় শ্রেণীর কীটনাশক ততটা বিষাক্ত নয় মাছের কাছে। কিন্তু মাছের খাদ্যকেই ধ্বংস করে ফেলে। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গিয়েছে খুব সামান্য মাত্রার কীটনাশক বিষও মাছের উৎপাদন হ্রাস করছে, ডিমকে নষ্ট করছে। শামুক ও ঝিনুকের মৃত্যু ঘটাচ্ছে শৈশবে দুর্বল করে দিচ্ছে অনেক মাছকে। ফলে তারা সহজেই তাদের ঘাতকের শিকার হচ্ছে। আবার পরোক্ষভাবে তারা ক্ষতি করছে মানুষের। খাদ্য-শৃংখলে প্রবিষ্ট ঐ কীটনাশক সামুদ্রিক মাছের মাধ্যমে চলে আসছে আমাদের শরীরে।

অবশ্য এটা ঠিক—এইসব রাসায়নিক ও অন্যান্য আবর্জনা এবং অজৈব সার, কীটনাশক, আগাছানাশক ইত্যাদি মিলিয়ে যে অসংখ্য রাসায়নিক দ্রব্য সমুদ্রে গিয়ে পড়ছে, তাদের একটা ভাগ পারস্পরিক বিক্রিয়ার ফলে প্রশমিত হয়ে যায়। আর আছে সমুদ্র-জলের স্বাভাবিক বিশুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়া। সাথে সাথে একথাও সত্যি যে দু'টি ক্ষতিকারক রাসায়নিক পদার্থের বিক্রিয়ায় সৃষ্টি হয় তৃতীয় এক ক্ষতিকারক রাসায়নিক বস্তু—যা প্রত্যক্ষভাবে সমুদ্রে বাহিত হয় নি।

4. উপকূল বনাম মানুষ

সমুদ্র থেকে সম্পদ আহরণ করতে গিয়ে সমুদ্র-উপকূলের পরিবেশ ব্যাহত করা হচ্ছে। নির্মিত হচ্ছে বসত বাড়ি, কারখানা বা হোটেল। উপকূলকে বেঁধে নিয়ে সমুদ্রে অনুপ্রবেশ করে নতুন জমি গড়ে তোলা হচ্ছে। সম্প্রসারিত হচ্ছে নগরায়ন। যেমন বোম্বাই শহরের মেরিন ড্রাইভ ও নরিম্যান পয়েন্ট। অবশ্য সমুদ্র তার বদলা নিতে ভোলে নি। ভারসোভা গ্রামখানি সমুদ্রগর্ভে চলে গিয়েছে। সমুদ্র সংলগ্ন জলাভূমি ভরাট করে হচ্ছে কারখানা বা বিমান-বন্দর। আবার সেগুলি রক্ষা করতে প্রচুর পাথরের চাঁই ফেলা হচ্ছে জলের সীমারেখাতে। নির্মিত হচ্ছে সমুদ্র-প্রাচীর। শত শত মাইল সমুদ্র-উপকূল রেখা বরাবর মানুষের এ জাতীয় অনুপ্রবেশ ঘটছে। ফলে সেখানকার বাস্তুতন্ত্রের স্বাভাবিকতা বিঘ্নিত হচ্ছে।

সমুদ্র উপকূলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ম্যানগ্রোভ অরণ্য। অবৈধ কাঠের ব্যবসায়, কৃষিক্ষেত্রের সম্প্রসারণ আর বাসস্থানের প্রয়োজনে বিনষ্ট হচ্ছে এই মূল্যবান অরণ্য। অসংখ্য জলজ প্রাণীর সূতিকা গৃহ এই ম্যানগ্রোভ অরণ্য। সমুদ্রের মাছ চলে এসে এখানে ডিম পাড়ে। শিশু মাছ জন্মায়—বড় হয় আবার চলে যায় সমুদ্রে। সেই ম্যানগ্রোভ অরণ্যবিনাশ সামুদ্রিক পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট করছে। এ পর্যন্ত সুন্দরবনের ও আন্দামানের ম্যানগ্রোভ অরণ্য সংহার করা হয়েছে যথাক্রমে 1500 বর্গ

কিমি এবং 12000 হেক্টর। উপকূলের এ জটিল বাস্তুতন্ত্রের সুরক্ষা কে করবে?

5. মাছ ধরা ট্রলারের দৌরাত্ম্য

1984-85 আর্থিক বছরে ভারতে সমুদ্র থেকে মাছ ধরা হয়েছে 1684783 টন। মাছ ধরায় চিরাচরিত জেলে নৌকা, যন্ত্রচালিত নৌকা এবং বড় ট্রলার ব্যবহৃত হচ্ছে। মোট সংগ্রহের পরিমাণে এদের অবদান যথাক্রমে 66%, 33% এবং 1%। কিন্তু এই বড় ট্রলারগুলি, যা পুঁজি-পতিদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, সমুদ্রের পরিবেশকে ব্যাহত করছে। বিদেশী পুঁজিকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে এবং তাঁরাও ভারতের উপকূল অঞ্চল চষে ফেলছেন। ব্যবহৃত হচ্ছে বিশেষ ধরনের জাল যা সমুদ্রের তলদেশকে ক্ষতবিক্ষত করে দেয় এবং মাছের বাস্তুতন্ত্রের ক্ষতি করে। প্রবালের সমাহারে আঘাত হানে। তলদেশে উদ্ভিদ ও বালির বিন্যাসকে নষ্ট করে। ছোট ছিদ্রযুক্ত জালে প্রচুর ছোট মাছ, অপরিণত মাছ ও চিংড়ি পড়ে এবং সেগুলি সমুদ্রেই ফেলে দেওয়া হয়। জুন থেকে আগস্ট মাছের ডিম পাড়া ও পোনাদের বড় হতে থাকার সময়। এ সময়তেও মুনাফাবাজরা ট্রলার দিয়ে নির্বিচারে মাছ ধরে। মাছের সংখ্যা বৃদ্ধি বিঘ্নিত হচ্ছে। গরীব মৎস্যজীবিরা আন্দোলন করছেন।

6. "নীল বিপ্লব" অর্থময় হবে কাদের কাছে

কল্পবিজ্ঞানের শিকড় থাকে বাস্তবের মাটিতে। নটিলাসের আরোহীদের দ্বারা দেখতে পাওয়া বঙ্গোপসাগরে ভেসে যেতে থাকা যে শবগুলির কথা জুল ভার্ণ বলেছেন তাদের উত্তরপুরুষদের অনেকেরও ঠিক সেই দশা হচ্ছে। শুধুমাত্র বারানসী থেকে প্রতি বছর প্রায় 3000 অর্ধদগ্ধ মৃতদেহ গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়া হয়। আর সব জায়গায় মিলে মোট 10,000 হতমান গ্রামীণ ভারতীয় দরিদ্রদের শবের এই হাল! সৎকারের অর্থ কে যোগাবে? শ্রেণীবিভক্ত এই সমাজে দারিদ্র্যই দূষণের কারণ বলে যাঁরা চীৎকার করেন প্রতি বছর 5ই জুন তারিখে, তাঁরা কি ভেবে দেখেন আন্তরিকভাবে, যে এই দারিদ্র্য সৃজনের পিছনে দরিদ্র মানুষদের কোনো হাত নেই?

সমগ্র জীবনমণ্ডল দূষিত হয়েই চলেছে—তার মধ্যে সমুদ্র রেহাই পাবে কি করে? 'সবুজ বিপ্লব' ভারতের ঘরে ঘরে খাদ্যের কণা পৌঁছে দিতে পারে নি। সমুদ্র-দূষণ নিয়ন্ত্রণ করে যদিও 'নীল বিপ্লব' সফল করা যায় সমুদ্র সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে, তবুও তার সুফল ভারতের দরিদ্রশ্রেণীর মুখে হাসির রেখাটুকু ফোটাতে পারবে না—এমন আশঙ্কা কি অমূলক? সমাজের একটা লোভী অংশের সামনে স্বর্ণভাণ্ডারের দ্বার মুক্ত করে দিলেও আপামর দরিদ্র ভারতবাসীর কাছে কি স্বপ্নই থেকে যাবে না 'নীল বিপ্লব'? □

সহায়তা সূত্র তথা কৃতজ্ঞতা

1. যোজনা; 15th August 89 Spl; 1—15. 6. 90.
2. Science Reporter; October '84; June '89.
3. Our Environment—Laeeq Futehally (National Book Trust, India, New Delhi).
4. Data-Bank '87 (The Economic Times, Calcutta).
5. Amrita Bazar Patrika; 11. 1. 87; 5. 6. 88.
6. The Telegraph; 5. 7. 87; 25. 3. 88; 2. 7. 88.
7. আনন্দবাজার পত্রিকা; 17. 6. 87
8. গণশক্তি; 24. 7. 89.
9. Narora Atomic Power Plant : The Untold Story—Network to Oust Nuclear Energy, New Delhi 52.
10. বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী; May—June '83
11. The State of India's Environment (84-85); Second Citizens Report—Edited by Anil Agarwala.
12. Indian Fisheries : Ecological and Environmental Problems and Resource Depletion—T. Kochary & T. Achary.

□ বিশ্বের জনসংখ্যার 15%, কিন্তু অরণ্যের 2%, ভারতে।
অরণ্য-উচ্ছেদ ইস্টের দ্বীপে এনেছিল পরিবেশ বিপর্যয়।
সবুজ রঙ প্রকৃতি সংরক্ষণের প্রতীক।

□ আমরা দক্ষিণপন্থী নই, বামপন্থীও নই, কিন্তু সামনে আছি
—গ্রীন পার্টি নেতা হাবার্ট গ্রুল।
গ্রীনরা পশ্চিম ইওরোপে এখন রাজনৈতিক ভারসাম্য সৃষ্টিকারী শক্তি।

□ তারাপুরের পরমাণু চুল্লী বিকলাঙ্গ শিশুজন্মের কারণ হয়েছে।
"পরিবেশ রক্ষাকারীরা আসলে বিদেশী দালাল"
—কেন্দ্রীয় জলসম্পদ মন্ত্রী মানুভাই কোটারিয়া।

□ সীসা দূষণ রোমসাম্রাজ্যের পতনের কারণ বলে ভাবা হয়। ভূমির লবণাক্ততা সুমেরু সভ্যতার বিলোপ ঘটায়।

□ সারকারখানা নির্গত সালফার ডাই-অক্সাইড গ্যাস ও বর্জ্যপদার্থে ওন্দা রামসাগরে ব্যাপক ফসলের ক্ষতি হচ্ছে।

সামুদ্রিক মাছের। আবর্জনার সাথে সমুদ্রে পড়ছে নানা রকম ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া। শামুক ও ঝিনুকের শরীরে তারা প্রবেশ করছে। হেপাটাইটিস ও আন্ত্রিক রোগের কারণ সৃষ্টি করছে। অথচ এ সব নিবারণের জন্য অনেক আইন প্রণীত হয়েছে আমাদের দেশে। কিন্তু শিল্প-আবর্জনা জাত সমুদ্র-দূষণ সমানে চলেছে। তাইতো ভারতের কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের ভূতপূর্ব চেয়ারম্যান নিলয় চৌধুরী বলেন, আমাদের পরিবেশ রক্ষাকারী আইনগুলি কাগুজে বাঘ!

2. পারমাণবিক আবর্জনা জনিত সমুদ্র দুষণ

স্বাভাবিকভাবে সমুদ্র-জলে আছে আলফা বিটা ও গামা রশ্মি। প্রতি লিটার জলে প্রায় 13 বেকারেল। সমুদ্রের তলদেশে সঞ্চিত দ্রব্যে এর পরিমাণ 500 বেকারেল থেকেও বেশি। এর সাথে যুক্ত হচ্ছে মানুষের সৃষ্টি করা তেজস্ক্রিয়তা। সমুদ্রের তলদেশে পারমাণবিক আবর্জনা জমা করা হচ্ছে। 1945 থেকে আজ পর্যন্ত সাগরের বুকে জমা হয়েছে 9টি পারমাণবিক চুল্লী আর 50টি পারমাণবিক অস্ত্র। বিশ্বের বৃহৎ 5টি শক্তিধরের মোট 544টি জাহাজ ঘুরে বেড়াচ্ছে সাগরে যাদের মধ্যেই আছে পরমাণু চুল্লী। 1976 সাল থেকে 1985 সাল পর্যন্ত সাগরের বুকে জমা করা হয়েছে মোট 45000 টন তেজস্ক্রিয় আবর্জনা। আমাদের নিজস্ব পরমাণু চুল্লীগুলির আবর্জনার পরিমাণ কম কি? প্রাথমিক কঠিন আবর্জনা, কম মাত্রার আবর্জনা, মধ্যবর্তী মাত্রার আবর্জনা ও উচ্চ মাত্রার আবর্জনার মিলিত পরিমাণ ছিল 1982 সালে 5200 ঘন মিটার যা 2000 সালে 115700 ঘন মিটারে দাঁড়াবে। যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দূষিত করে চলবে আমাদের সমুদ্র অঞ্চলকে। ফলে খাদ্যচক্রের মধ্যে তেজস্ক্রিয়তার অনুপ্রবেশ ঘটবে এবং সমুদ্রের ভোজ্য জীবন-সম্পদের মাধ্যমে তা প্রবেশ করতে বাধ্য মানুষের শরীরে। পরমাণু চুল্লী থেকে তেজস্ক্রিয় দূষণ ছাড়াও সাংঘাতিক মাপের তাপ-দূষণ হয়। তাই পরমাণু চুল্লী স্থাপনের সময় বৃহৎ জলের উৎসের নিকটবর্তী স্থান বাছাই করা হয় এবং উৎপাদিত তাপের প্রায় 70% ভাগ ছেড়ে দেওয়া হয় জলের উৎসে। ফলে জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদের কাছে তা হয়ে দাঁড়ায় বিপজ্জনক। সমুদ্রের জলে সঞ্চিত তাপের ভারসাম্য নষ্ট করে তা আবহাওয়ার ক্ষেত্রে সুদূর প্রসারী প্রভাব ডেকে আনতে পারে।

3. কৃষিক্ষেত্র বিধৌত দ্রব্যে সমুদ্র-দুষণ

দেশে 'সবুজ বিপ্লব' হয়েছে। বেড়েছে উচ্চফলনশীল শস্য-চাষ। ক্রমাগত প্রচারে ভারতীয় চাষীরা জৈব সারে প্রাধান্য না দিয়ে অজৈব রাসায়নিক সার, কীটনাশক ও আগাছানাশক ব্যবহারে প্ররোচিত হয়েছে ভীষণভাবে। একমাত্র 1986-87 সালেই মোট 9500 000 টন নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশিয়াম ঘটিত সার ব্যবহার করা হয়েছে। জমিতে প্রয়োগ করা ঐ সব রাসায়নিক বস্তুর বিপুল একটা অংশ থেকে যায় অব্যবহৃত। ভূগর্ভ জলকে দূষিত করা ছাড়াও এরা নদীবাহিত হয়ে সমুদ্র দূষণের কারণ ঘটায়। প্রতিবছর প্রায় 77420 টন কীটনাশক ও আগাছা-নাশক ব্যবহার করা হচ্ছে। 1976-80 সালে এই সব বিষ উৎপাদিত হয়েছে মোট 250 000 টন। এর অন্তত 25% ভাগ অবশেষে সাগরে গিয়ে জমেছে। প্রধানত দু জাতের কীটনাশক আছে। অরগানোক্লোরিন এবং অরগানোফসফেট। ডি ডি টি আর বি এইচ সি পড়ে প্রথম শ্রেণীতে। এরা সহজে অবনয়িত হয় না এবং সমুদ্রযাত্রার পর সামুদ্রিক প্রাণীদের টিস্যুতে থেকে যায়। দ্বিতীয় শ্রেণীর কীটনাশক ততটা বিষাক্ত নয় মাছের কাছে। কিন্তু মাছের খাদ্যকেই ধ্বংস করে ফেলে। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গিয়েছে খুব সামান্য মাত্রার কীটনাশক বিষও মাছের উৎপাদন হ্রাস করছে, ডিমকে নষ্ট করছে। শামুক ও ঝিনুকের মৃত্যু ঘটাচ্ছে শৈশবে দুর্বল করে দিচ্ছে অনেক মাছকে। ফলে তারা সহজেই তাদের ঘাতকের শিকার হচ্ছে। আবার পরোক্ষভাবে তারা ক্ষতি করছে মানুষের। খাদ্য-শৃংখলে প্রবিষ্ট ঐ কীটনাশক সামুদ্রিক মাছের মাধ্যমে চলে আসছে আমাদের শরীরে।

অবশ্য এটা ঠিক—এইসব রাসায়নিক ও অন্যান্য আবর্জনা এবং অজৈব সার, কীটনাশক, আগাছানাশক ইত্যাদি মিলিয়ে যে অসংখ্য রাসায়নিক দ্রব্য সমুদ্রে গিয়ে পড়ছে, তাদের একটা ভাগ পারস্পরিক বিক্রিয়ার ফলে প্রশমিত হয়ে যায়। আর আছে সমুদ্র-জলের স্বাভাবিক বিশুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়া। সাথে সাথে একথাও সত্যি যে দু'টি ক্ষতিকারক রাসায়নিক পদার্থের বিক্রিয়ায় সৃষ্টি হয় তৃতীয় এক ক্ষতিকারক রাসায়নিক বস্তু—যা প্রত্যক্ষভাবে সমুদ্রে বাহিত হয় নি।

4. উপকূল বনাম মানুষ

সমুদ্র থেকে সম্পদ আহরণ করতে গিয়ে সমুদ্র-উপকূলের পরিবেশ ব্যাহত করা হচ্ছে। নির্মিত হচ্ছে বসত বাড়ি, কারখানা বা হোটেল। উপকূলকে বেঁধে নিয়ে সমুদ্রে অনুপ্রবেশ করে নতুন জমি গড়ে তোলা হচ্ছে। সম্প্রসারিত হচ্ছে নগরায়ন। যেমন বোম্বাই শহরের মেরিন ড্রাইভ ও নরিম্যান পয়েন্ট। অবশ্য সমুদ্র তার বদলা নিতে ভোলে নি। ভারসোভা গ্রামখানি সমুদ্রগর্ভে চলে গিয়েছে। সমুদ্র সংলগ্ন জলাভূমি ভরাট করে হচ্ছে কারখানা বা বিমান-বন্দর। আবার সেগুলি রক্ষা করতে প্রচুর পাথরের চাঁই ফেলা হচ্ছে জলের সীমারেখাতে। নির্মিত হচ্ছে সমুদ্র-প্রাচীর। শত শত মাইল সমুদ্র-উপকূল রেখা বরাবর মানুষের এ জাতীয় অনুপ্রবেশ ঘটছে। ফলে সেখানকার বাস্তুতন্ত্রের স্বাভাবিকতা বিঘ্নিত হচ্ছে।

সমুদ্র উপকূলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ম্যানগ্রোভ অরণ্য। অবৈধ কাঠের ব্যবসায়, কৃষিক্ষেত্রের সম্প্রসারণ আর বাসস্থানের প্রয়োজনে বিনষ্ট হচ্ছে এই মূল্যবান অরণ্য। অসংখ্য জলজ প্রাণীর সূতিকা গৃহ এই ম্যানগ্রোভ অরণ্য। সমুদ্রের মাছ চলে এসে এখানে ডিম পাড়ে। শিশু মাছ জন্মায়—বড় হয় আবার চলে যায় সমুদ্রে। সেই ম্যানগ্রোভ অরণ্যবিনাশ সামুদ্রিক পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট করছে। এ পর্যন্ত সুন্দরবনের ও আন্দামানের ম্যানগ্রোভ অরণ্য সংহার করা হয়েছে যথাক্রমে 1500 বর্গ

কিমি এবং 12000 হেক্টর। উপকূলের এ জটিল বাস্তুতন্ত্রের সুরক্ষা কে করবে?

5. মাছ ধরা ট্রলারের দৌরাত্ম্য

1984-85 আর্থিক বছরে ভারতে সমুদ্র থেকে মাছ ধরা হয়েছে 1684783 টন। মাছ ধরায় চিরাচরিত জেলে নৌকা, যন্ত্রচালিত নৌকা এবং বড় ট্রলার ব্যবহৃত হচ্ছে। মোট সংগ্রহের পরিমাণে এদের অবদান যথাক্রমে 66%, 33% এবং 1%। কিন্তু এই বড় ট্রলারগুলি, যা পুঁজিপতিদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, সমুদ্রের পরিবেশকে ব্যাহত করছে। বিদেশী পুঁজিকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে এবং তাঁরাও ভারতের উপকূল অঞ্চল চষে ফেলছেন। ব্যবহৃত হচ্ছে বিশেষ ধরনের জাল যা সমুদ্রের তলদেশকে ক্ষতবিক্ষত করে দেয় এবং মাছের বাস্তুতন্ত্রের ক্ষতি করে। প্রবালের সমাহারে আঘাত হানে। তলদেশে উদ্ভিদ ও বালির বিন্যাসকে নষ্ট করে। ছোট ছিদ্রযুক্ত জালে প্রচুর ছোট মাছ, অপরিণত মাছ ও চিংড়ি পড়ে এবং সেগুলি সমুদ্রেই ফেলে দেওয়া হয়। জুন থেকে আগস্ট মাছের ডিম পাড়া ও পোনাদের বড় হতে থাকার সময়। এ সময়তেও মুনাফাবাজরা ট্রলার দিয়ে নির্বিচারে মাছ ধরে। মাছের সংখ্যা বৃদ্ধি বিঘ্নিত হচ্ছে। গরীব মৎস্যজীবিরা আন্দোলন করছেন।

6. "নীল বিপ্লব" অর্থময় হবে কাদের কাছে

কল্পবিজ্ঞানের শিকড় থাকে বাস্তবের মাটিতে। নটিলাসের আরোহীদের দ্বারা দেখতে পাওয়া বঙ্গোপসাগরে ভেসে যেতে থাকা যে শবগুলির কথা জুল ভার্ণ বলেছেন তাদের উত্তরপুরুষদের অনেকেরও ঠিক সেই দশা হচ্ছে। শুধুমাত্র বারানসী থেকে প্রতি বছর প্রায় 3000 অর্ধদগ্ধ মৃতদেহ গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়া হয়। আর সব জায়গায় মিলে মোট 10,000 হতমান গ্রামীণ ভারতীয় দরিদ্রদের শবের এই হাল! সৎকারের অর্থ কে যোগাবে? শ্রেণীবিভক্ত এই সমাজে দারিদ্র্যই দূষণের কারণ বলে যাঁরা চীৎকার করেন প্রতি বছর 5ই জুন তারিখে, তাঁরা কি ভেবে দেখেন আন্তরিকভাবে, যে এই দারিদ্র্য সৃজনের পিছনে দরিদ্র মানুষদের কোনো হাত নেই?

সমগ্র জীবনমণ্ডল দূষিত হয়েই চলেছে—তার মধ্যে সমুদ্র রেহাই পাবে কি করে? 'সবুজ বিপ্লব' ভারতের ঘরে ঘরে খাদ্যের কণা পৌঁছে দিতে পারে নি। সমুদ্র-দূষণ নিয়ন্ত্রণ করে যদিও 'নীল বিপ্লব' সফল করা যায় সমুদ্র সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে, তবুও তার সুফল ভারতের দরিদ্রশ্রেণীর মুখে হাসির রেখাটুকু ফোটাতে পারবে না—এমন আশঙ্কা কি অমূলক? সমাজের একটা লোভী অংশের সামনে স্বর্ণভাণ্ডারের দ্বার মুক্ত করে দিলেও আপামর দরিদ্র ভারতবাসীর কাছে কি স্বপ্নই থেকে যাবে না 'নীল বিপ্লব'? □

সহায়তা সূত্র তথা কৃতজ্ঞতা

1. যোজনা; 15th August 89 Spl; 1—15. 6. 90.
2. Science Reporter; October '84; June '89.
3. Our Environment—Laeeq Futehally (National Book Trust, India, New Delhi).
4. Data-Bank '87 (The Economic Times, Calcutta).
5. Amrita Bazar Patrika; 11. 1. 87; 5. 6. 88.
6. The Telegraph; 5. 7. 87; 25. 3. 88; 2. 7. 88.
7. আনন্দবাজার পত্রিকা; 17. 6. 87
8. গণশক্তি; 24. 7. 89.
9. Narora Atomic Power Plant: The Untold Story—Network to Oust Nuclear Energy, New Delhi 52.
10. বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী; May—June '83
11. The State of India's Environment (84-85); Second Citizens Report—Edited by Anil Agarwala.
12. Indian Fisheries: Ecological and Environmental Problems and Resource Depletion—T. Kocharay & T. Achary.

□ বিশ্বের জনসংখ্যার 15%, কিন্তু অরণ্যের 2%, ভারতে।
অরণ্য-উচ্ছেদ ইস্টের দ্বীপে এনেছিল পরিবেশ বিপর্যয়।
সবুজ রঙ প্রকৃতি সংরক্ষণের প্রতীক।

□ আমরা দক্ষিণপন্থী নই, বামপন্থীও নই, কিন্তু সামনে আছি
—গ্রীন পার্টি নেতা হাবার্ট গ্রুল।
গ্রীনরা পশ্চিম ইওরোপে এখন রাজনৈতিক ভারসাম্য সৃষ্টিকারী শক্তি।

□ তারাপুরের পরমাণু চুল্লী বিকলাঙ্গ শিশুজন্মের কারণ হয়েছে।
"পরিবেশ রক্ষাকারীরা আসলে বিদেশী দালাল"
—কেন্দ্রীয় জলসম্পদ মন্ত্রী মানুভাই কোটারিয়া।

□ সীসা দূষণ রোমসাম্রাজ্যের পতনের কারণ বলে ভাবা হয়। ভূমির লবণাক্ততা সুমেরু সভ্যতার বিলোপ ঘটায়।

□ সারকারখানা নির্গত সালফার ডাই-অক্সাইড গ্যাস ও বর্জ্যপদার্থে ওন্দা রামসাগরে ব্যাপক ফসলের ক্ষতি হচ্ছে।

সমুদ্রের জীবন সম্পদ

ভৃগুনাথ সিং

বিশ্বের ক্ষুধা নিবৃত্তি আজকের দিনের এক বিশেষ জরুরী বিষয়। উন্নত দেশগুলি প্রচেষ্টা চালাচ্ছে এই ক্ষুধা নিবারণের সামগ্রীর একটা অংশ সমুদ্র থেকে আহরণ করতে। সমুদ্র থেকে বিশ্বের আহার সংগ্রহের বিশেষ কার্যক্রম নেওয়া হয়েছে। বিশেষ নজর পড়েছে তাই সমুদ্রবিদ্যা ও সামুদ্রিক জীবন-বিজ্ঞান চর্চার দিকে। গভীর প্রয়াস চলছে সমুদ্রের জীবন সম্পদ সংগ্রহের। সমুদ্রের জীবন সম্পদের পাঁচটি বিভিন্ন উৎস—

(ক) মৎস্য শিকার
(খ) মৎস্য চাষ
(গ) সামুদ্রিক আগাছা
(ঘ) ম্যানগ্রোভ অরণ্য
(ঙ) প্রবাল।

সারা পৃথিবীর উপরি তলের চার ভাগের তিন ভাগে সমুদ্রের বিস্তার। গভীরতার গড় 3730 মিটার। জীবন সম্পদ আহরণের জন্য প্রকৃষ্ট স্থান হচ্ছে জলের ওপরের দিকের 100 মিটার পুরু আস্তর খানি। জৈব বস্তুর সালোকসংশ্লেষধর্মী উৎপাদন ঘটে থাকে এই অঞ্চলে। সারা পৃথিবীর সব সমুদ্রের মোট 1·8% অধিকার করে আছে এই অঞ্চল। এই অঞ্চল থেকেই সারা পৃথিবীর সামুদ্রিক মৎস্য শিকারের 50% পাওয়া যাচ্ছে বর্তমানে। সমুদ্রের উপকূলে অথবা সমুদ্রের তীরভূমি থেকে দূরে অবস্থান যেখানেই হোক না কেন—সমুদ্রের উর্বর এই অঞ্চলের নাম দেওয়া হয়েছে 'সমুদ্রের মরূদ্যান'।

ভারতবর্ষে সামুদ্রিক মৎস্য সংগ্রহের প্রধান উপায় মৎস্য শিকার। এই জন্য উপকূলবর্তী সংকীর্ণ বলয় বেছে নেওয়া হয়েছে। আমাদের দেশে 1947 সালে সামুদ্রিক মৎস্য সংগ্রহের পরিমাণ ছিল 0·4 মিলিয়ন টন। 1979-80 সালে তা বেড়ে হলো 1·4 মিলিয়ন টন। বর্তমানে হয়েছে 1 6 মিলিয়ন টন। বৃদ্ধির হার অসম হলেও ইতিমধ্যেই আমাদের দেশ এই বিষয়ে সারা পৃথিবীর মধ্যে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে।

সারা বিশ্বের উৎপাদিত খাদ্যবস্তুর 4% ভাগ হলো মাছ। এশিয়া মহাদেশে মাছ থেকেই পাওয়া যায় মোট প্রোটিনের 45% ভাগ। বিগত 27 বছরে আমাদের দেশ সামুদ্রিক খাদ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে বিশ্বের অগ্রবর্তী দেশ সমূহের মধ্যে স্থান অধিকার করে নিয়েছে। 1962 সালে যে রপ্তানি মূল্য ছিল 4 কোটি টাকা, 1988 সালে তা বেড়ে হয়েছে 600 কোটি টাকা।

বিজ্ঞানীরা ভাবছেন সম্ভাবনাময় ও সহনযোগ্য জৈব-সম্পদ আহরণ কতটুকু হতে পারে। আশা করা যায়, একান্ত অর্থনৈতিক এলাকা থেকে উৎপাদিত হতে পারে 3 মিলিয়ন টন। 2000 সাল নাগাদ আমাদের দেশের মাছের চাহিদা হবে ধরা হচ্ছে 11·4 মিলিয়ন টন। এর মধ্যে 60—75% সমুদ্র থেকে পাওয়া যাবে বলে ধরা হচ্ছে। অবশিষ্ট 25—40% আসবে অন্যান্য সূত্র থেকে।

মাছ চাষের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি আছে আমাদের দেশে—অন্ধ্র, কেরল, কর্ণাটক ও পশ্চিমবাংলার খাঁড়ি অঞ্চলে। দেশীয় এই পদ্ধতিতে স্লুইস গেটের মাধ্যমে ঘেরা জায়গাতে জোয়ারের জল প্রবেশ করিয়ে নেওয়া হয়। এই জলের সাথে আসে মাছ ও চিংড়ির পোনা। 3 থেকে 9 মাস এরা বাড়তে থাকে ওই আবদ্ধ জলে। বর্তমানে এই ভাবে প্রায় 20,000 টন মাছ পাওয়া যাচ্ছে। বিজ্ঞানীরা আশা করছেন আগামী 2000 সালের মধ্যে পাওয়া যাবে 4 মিলিয়ন টন মাছ। তার মধ্যে 2·5 মিলিয়ন টন আসবে উপকূলের খাঁড়ি অঞ্চলের এই দেশীয় পদ্ধতির চাষ থেকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 200) সালের মধ্যে সারা বিশ্বের মৎস্য চাষে উৎপাদন হবে, আশা করা যায়, 70 মিলিয়ন টন। এবং এর এক বিপুল অংশ উৎপাদিত হবে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে।

শম্বুক জাতীয় প্রাণীগোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে এমন কিছু খোলসযুক্ত সামুদ্রিক প্রাণী খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন ক্ল্যাম, স্কুইড এবং অক্টোপাস। দূর প্রাচ্য এবং ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে এদের চাহিদা বিপুল। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ক্ল্যাম খাদ্য হিসাবে সুদীর্ঘকাল ধরে ব্যবহৃত হয়ে চলেছে। আবার এদের শক্ত খোলস দিয়ে তৈরী হয় অলংকার এবং নানাবিধ ব্যবহার্য দ্রব্য সামগ্রী। সম্প্রতি ইন্দোনেশিয়াতে এদের খোলস দিয়ে নির্মিত হচ্ছে ঘরের মেঝের টালি। আন্তর্জাতিক হোটেলে এরই ঝোল মনোহরণ করছে পর্যটকদের। তাছাড়া স্কুইডে আছে প্রচুর ভিটামিন। স্ক্যালপ জাতীয় শামুক ও মাসেল জাতীয় শুক্তি, সমৃদ্ধ হয়ে আছে নানা অণুমৌল পদার্থে ও অ্যামিনো-অ্যাসিডে। মানব দেহের জন্য এগুলি একান্ত প্রয়োজনীয় ও দুর্লভ উপাদান।

আর সামুদ্রিক আগাছার ব্যবহার আরো ব্যাপক। মানুষ ও পশুর খাদ্য তো বটেই। তা ছাড়া ব্যবহৃত হয় সার হিসাবে। রসায়ন, ভেষজ ও প্রসাধনের ক্ষেত্রে এর অবদান আছে। এই সামুদ্রিক সম্পদের উৎপাদন সারা পৃথিবীতে মোট 172,000 টন প্রতি বৎসর। ভারতের অবদান এরমধ্যে 2%। শিল্পে ব্যবহারের জন্য অ্যাগারোফাইট ও অ্যালগিনোফাইট সামুদ্রিক আগাছার চাহিদা প্রচুর বেড়ে গেছে। আমাদের দেশে এদের

সুসংবদ্ধ শিল্পায়ন শুরু হবার আগে বছরে প্রায় 200 টন বিশুষ্ক সামুদ্রিক আগাছা বিদেশে রপ্তানি করা হতো।

ম্যানগ্রোভ অরণ্যের বাস্তুতন্ত্র সমুদ্রের এক বিশেষ দান মানব সমাজের জন্য। অথচ অতীতে একে ভাবা হতো অবাঞ্ছিত। কাঠ-কয়লা ও কাঠের জন্য ধ্বংশ হয়েছে এই সব অরণ্যের বিশাল অংশ। কিন্তু সম্প্রতি ম্যানগ্রোভ অরণ্যকে বাস্তুতন্ত্রের দিক থেকে অতীব গুরুত্বপূর্ণ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। সমুদ্র উপকূলের ভূমিক্ষয় রোধ ছাড়াও বহু সামুদ্রিক মাছ ও প্রাণীদের সূতিকা গৃহের ভূমিকা পালন করে এই ম্যানগ্রোভ অরণ্য। তাছাড়া সামুদ্রিক জীবনের জন্য খাদ্যও সরবরাহ করে। ভারতের সৌভাগ্য এই যে এদেশে দুটি সুবিখ্যাত ম্যানগ্রোভ অরণ্য আছে। পশ্চিমবাংলাতে রয়াল বেঙ্গল টাইগারের বাসস্থান সুন্দরবন আর আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের ম্যানগ্রোভ অরণ্য।

আমাদের সমুদ্র-সম্পদের জৈব দিকের এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে প্রবাল। জীববিজ্ঞানে উৎপাদনশীল, প্রাণীকুলের শ্রেণীবিভাজনের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যময় এবং অর্থনীতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ এই প্রবাল। সমুদ্র-তরঙ্গ থেকে রক্ষা করে অনেক সামুদ্রিক প্রাণী ও উদ্ভিদকে। তাদের জন্য গড়ে তোলে নিরাপদ আশ্রয়। বস্তুত প্রবাল প্রাচীর একটি নিজস্ব বাস্তুতন্ত্র গড়ে তোলে। সাঁতারুদের কাছে এর আকর্ষণ দুর্নিবার। জলের অভ্যন্তরের ফটোগ্রাফী এবং প্রবাল সংগ্রহ পর্যটন শিল্পের সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

ভারতকে ভাগ্যবান বলতে হয় এই কারণে যে ভারতের উপকূল সীমা প্রায় 7000 কিমি। ভারতের মোট জন সংখ্যা 850 মিলিয়ন। তার মধ্যে 25% ভাগ সমুদ্র উপকূল থেকে 100 মাইলের মধ্যে বাস করে বলে ধরা যায়। এই বিপুল সংখ্যক মানুষের সংখ্যা হয় 212 মিলিয়ন। তাঁদের জীবিকার প্রশ্নে, তাঁরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভর করেন সমুদ্রের উপর।

ভারতের জনসংখ্যা 2000 সাল নাগাদ 1000 মিলিয়ন হবে বলে অনুমান করা হয়। বিপরীত পক্ষে ব্যাপক নগরায়নের ফলে কৃষি জমির পরিমাণ ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে। জনসংখ্যার এই বিপুল চাপ ও তাদের খাদ্য সরবরাহের কাজ ভারতের কাছে একটি বিশাল দায়। এই সমস্যার সমাধানে সমুদ্রের জীবন-সম্পদ একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। □

"সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রকৃতি বিনাশ"

[এটি রাশিয়াতে নিষিদ্ধ এক পুস্তকের নাম। লেখক বোরিস কোমারভ। সম্ভবত ছদ্মনাম। নিষিদ্ধ হবার পরে বইটি গোপনে মুদ্রিত হয়। 1982-র 5ই নভেম্বর কোমারভের এই বইটির উপর একটি আলোচনা প্রকাশিত হয় আমেরিকার বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্রে। আলোচনাটির একটি সংক্ষিপ্ত রূপ প্রকাশ করছি আমরা। কোলকাতার International Books প্রকাশিত রঞ্জন বাচস্পতির বই 'The World Proletarian Revolution & The Neo-Bourgeiose (Destruction of Nature in Soviet Union)' এই আলোচনার একমাত্র সূত্র। ভাষান্তর করেছেন বিশুদ্ধানন্দ পুরকাইত—স. ম.]

বছরের পর বছর রাশিয়া আঙুল তুলে দেখিয়েছে আমেরিকাকে। বলেছে পরিবেশগত দুর্ঘটনাগুলি আমেরিকার ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অরাজকতারই ফল। সত্যিই তাই। কিন্তু রাশিয়ার নিজের অবস্থাটা কি? রাশিয়ার পরিবেশ বিষয়ে কোনো রচনা আমেরিকাতে সহজলভ্য নয়। সেই অভাব পূর্ণ করতে এসেছে বোরিস কোমারভ রচিত 'সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রকৃতি বিনাশ' বইখানি। এটি সুরচিত এবং তথ্যপুর্ণ।

1980 সালে রাশিয়া পরিবেশ বিষয়ে এক উচ্চ পর্যায়ের সমীক্ষা চালিয়ে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে প্রকাশ করে এক প্রতিবেদন। এটি শুধু সংখ্যক সরকারি আমলাদের পড়ানো হয় গোপন রাখার শপথ নেবার পর। প্রতিবেদনখানির শিরোনাম 'প্রকৃতি 1980'। ঐ প্রতিবেদনে বলা আছে—"যেহেতু আমাদের জাতীয় অর্থনীতি বিকাশিত হয়ে চলেছে, সে কারণে 1990 সালেও আবহাওয়া দূষণ বজায় থাকবে। কোনো কোনো শিল্প কেন্দ্রে তা স্বাস্থ্যের পক্ষে বিপদ জনক মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে পারে।" পরিবেশ দূষণের সাথে সম্পর্কিত কিছু কিছু রোগ সংক্রান্ত পরিসংখ্যান উল্লিখিত হয়েছে।

বিগত দশকে রাশিয়াতে দ্বিগুণ হয়েছে ফুসফুসের ক্যান্সার। জিন ঘটিত রোগ নিয়ে জন্মাচ্ছে এমন শিশুর সংখ্যা প্রতি বছর 5% থেকে 6% বেড়ে যাচ্ছে। বছরে বছরে "স্বতঃস্ফূর্ত" গর্ভপাতের ঘটনা 6% থেকে 7%

বাড়ছে। মোট জনসংখ্যার 7% থেকে 8%এর মধ্যে জিন থেকে সৃষ্ট অক্ষমতা পরিদৃষ্ট হচ্ছে। অনুমিত হচ্ছে 1990 নাগাদ এরাই হয়ে যাবে মোট জনসংখ্যার 15% অর্থাৎ আগামী দিনে প্রতি 6 জনের মধ্যে একজন হবে দৈহিক বা মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী।

সীসা ও তৈল দূষণে পাল্লা দিচ্ছে রাশিয়া পশ্চিমী দেশগুলির সাথে। বড় বড় শহরে বহু শিশুর জননতন্ত্রে ধরা পড়ছে সীসার উপস্থিতি। ক্রমশ বাড়ছে বেরেলিয়াম দূষণ। অনেক স্বাস্থ্যকর স্থানের জলে মিলছে বোরোন যার অধিক মাত্রা মানুষের প্রজনন শক্তিকে খর্ব করে দেয়।

উরাল পর্বতশ্রেণীর পূর্ব পার্শ্বে সোবিয়েতের 'থ্রি মাইলস আইল্যাণ্ড' চেলিয়াবিন্স্ক। এটি পরমাণু আবর্জনার বিশাল এক পরিত্যাগ ক্ষেত্র। 1958 তে এখানে বিরাট বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। তেজস্ক্রিয় ছাই ছড়িয়ে পড়ে 200 কিমি ব্যাসার্ধের সুবিশাল অঞ্চলে। হাজার হাজার বাসিন্দাকে স্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত করা হয়। কিন্তু রাশিয়া আজ পর্যন্ত এই দুর্ঘটনার কথা স্বীকার করে নি। আরো বিস্ময়ের কথা, আমেরিকা, ব্রিটেন বা ফ্রান্স এ ব্যাপারে নীরবতা ভঙ্গ করেন নি কারণ পারমাণবিক শক্তির পাশা খেলায় তাঁরা নিজেরাও অংশীদার।

কৃষিক্ষেত্রেও দূষণের দাপট। তৈল, ধোঁয়া আর হরেক রকম রাসায়নিক বিষে কৃষকরাও বিপন্ন।

কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়া এ সব কথা স্বীকার করে না। বলা হয়, "সোভিয়েত রাশিয়াতে পরিবেশ রক্ষার গ্যারান্টি হচ্ছে উৎপাদনের উপায় ও প্রাকৃতিক সম্পদগুলির ওপরে সর্বজনীন অধিকার।" কিন্তু আসল দিক হচ্ছে সেখানে প্রাকৃতিক দূষণের ঘটনাবলি ক্রমশ বেড়েই চলেছে।

বর্তমানে সোভিয়েত রাশিয়ার পরিবেশ সংক্রান্ত কার্যাবলি কিসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, সেটা আরো বেশী ধরা পড়েছে বইটির সাইবেরিয়া সম্পর্কিত অধ্যায়।

সাইবেরিয়া এই গ্রহের সর্ববৃহৎ মুক্ত ভূমি। বিগত পঞ্চাশ দশক পর্যন্ত সাইবেরিয়া ছিল 'উন্নয়নের স্পর্শ' থেকে দূরে। ষাট ও সত্তরের দশকে সরকারি নজর পড়ে এখানে। 'উন্নয়ন' হবে। অন্যতম প্রাচীন হ্রদ বৈকাল - বিশ্বের গভীরতম স্বাদু জলের আধার ও নানাবিধ স্পর্শকাতর ও অনন্য জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদের আশ্রয়। প্রতি বছর হাজার হাজার মানুষ আসেন এই হ্রদ দেখতে। স্থানীয় আদি অধিবাসীদের জীবন ও জীবিকার কেন্দ্র ও সহযোগী এই বিশাল হ্রদ। কিন্তু সোভিয়েত সরকারের এটা চাই। কারণ তাঁদের নতুন বোমারু বিমানের টায়ারের তন্তু তৈরীর জন্য কাগজের ও অন্যান্য জিনিসের মণ্ড প্রস্তুতের দরকার। আর সে জন্য প্রয়োজন বিশাল পরিমাণ স্বাদু জল! প্রতিরক্ষা দপ্তরের এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে অভূতপূর্ব ও বিপুল গণ প্রতিবাদ সূচিত হলো। কিন্তু সরকারী পরিকল্পনা এগিয়ে গেলো তাকে পদদলিত করে। সোভিয়েত বিজ্ঞান অ্যাকাডেমির বিতর্ক সভাতে বড় এক বিজ্ঞানী বললেন —"বৈকাল নিয়ে কি শুরু করেছি আমরা! দরকার যদি হয় তো হোক বৈকাল দূষিত। আমাদের হাতে আছে পরমাণু শক্তি। বিস্ফোরণ ঘটিয়ে সুবিশাল এক গর্তের সৃষ্টি করে আর তাতে জল ভরে আমরা তৈরী করে নেবো নতুন আর এক বৈকাল।" সব গণপ্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে কারখানাটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল বৈকালের তীরে। পরে এলো আরো দুটি কারখানা। সীসার জন্য আর দস্তার জন্য। দুটিই যুদ্ধে ব্যবহার্য ধাতু। শুধু বৈকালের তীরে নয়, সাইবেরিয়ার অন্যান্য অংশেও এলো 'উন্নয়নের' তরঙ্গ! ভূগর্ভের খনিজ তৈল সম্পদে হাত পড়লো। বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ আর প্রতিরক্ষাতে ব্যবহার উভয় দিক সামলাতে ব্যাপক তৈল উত্তোলন শুরু হয়ে গেল।

সূচনা হলো ব্যাপক অরণ্য ধ্বংসের। বছরে বছরে 2—3 লক্ষ বর্গ কিমি অরণ্য লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। কারণ বিস্ফোরক দ্রব্য প্রস্তুতের প্রতিরক্ষা কারখানাগুলির কাঠের প্রয়োজন।

কোমারভের বইতে পাওয়া গিয়েছে এক চাঞ্চল্যকর শিকার অভিযানের বর্ণনা। রাশিয়া অধিকৃত ইউরোপের অপেক্ষাকৃত কম উন্নয়নের অঞ্চল আজারবাইজান। প্রচুর বন্যপ্রাণীর আশ্রয়স্থল এই আজারবাইজানের অরণ্যভূমি। সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত বনাঞ্চল বলে ঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও ষাট দশকের শেষে মার্শাল চুইকভ সদলবলে এখানে মৃগয়ায় নেমে পড়েন। নির্বিচারে বন্য হাঁস, হরিণ ও অন্যান্য প্রাণী হত্যা করেন সামরিক হেলিকপ্টার, ভূমি-থেকে-ভূমি ক্ষেপণাস্ত্র এবং স্বয়ংক্রিয় রাইফেল ব্যবহার করে। আজারবাইজানের মানুষদের কাছে আজো তা বিভীষিকাময় স্মৃতি হয়ে আছে।

সাইবেরিয়ার বিভিন্ন আদি অধিবাসী গোষ্ঠী 'উন্নয়নের' ধাক্কায় নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলেছে। মদ্যপান সাংঘাতিকভাবে বেড়ে গিয়েছে। যৌন রোগের ব্যাপকতা চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্থানীয় ভাষাগুলিকে তাড়িয়ে সাইবেরিয়া দখল করে নিয়েছে রুশ ভাষা। 'উন্নয়নের' অছিলায় সাইবেরিয়াতে আসেন "মহান" রুশ ব্যক্তিবর্গ। উপভোগ করেন সাইবেরিয়ার আদিবাসী রমণীদের সঙ্গ আর কয়েক বছর পরে সন্তানসহ রমণীদের পরিত্যাগ করে হঠাৎ উধাও হন।

বইটির উপসংহারে কোমারভ দেখিয়েছেন যে পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যাগুলি নিয়ে গভীর ভাবনা চিন্তা ও সেই অনুযায়ী কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করার কোনো সত্যিকারের ইচ্ছা সোভিয়েত সরকারের নেই। তা সত্ত্বেও এই সব সমস্যা যে বেড়ে চলেছে এটা বোঝার ফলে এলোপাথাড়ি প্রচুর বিতর্ক ও সংস্কারমূলক প্রস্তাবের বন্যা বইছে।

এই ধরনের অদ্ভুতএক কর্মসূচীর নাম 'দূষণের জন্য দাম দিন'। এই কর্মসূচী অনুসারে কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান তাঁদের পণ্যসামগ্রী উৎপাদনের খরচের সাথে কত দামের প্রাকৃতিক সম্পদ বিনষ্ট করেছেন সেটা অন্তর্ভুক্ত করেন। এটাকে তাঁরা পরিবেশ সংরক্ষণের বস্তুগত উৎসাহদানকারী (Material Incentive) বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু কোমারভ দেখিয়েছেন এই কর্মসূচী অনুযায়ী কোনো শিল্প-প্রতিষ্ঠান তখনই তাঁদের

বর্জ্য পদার্থ শোধন করার জন্য খরচ করবেন যখন প্রকৃতি ধ্বংস ও জন-স্বাস্থ্যের ক্ষতির যৌথ পরিমাণ বর্জ্য পদার্থগুলির শোধন-ক্রিয়ার খরচের থেকে বেশী হয়ে পড়ে। কাজেই এরকম বাস্তব সম্ভাবনা খুবই রয়েছে যে যদি বায়ু-দূষণের ফলে প্রধানত অবসার প্রাপ্ত বৃদ্ধ বা শিশুরা ক্ষতিগ্রস্ত হন বা গর্ভপাত ছাড়া অন্য কোনো ক্ষতি চোখে না পড়ে (1973-74 সালে ব্লাডিভোস্টকের এক জেলাতে এরকম ঘাটছিলো) তবে সেই অঞ্চলে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত অতিরিক্ত খরচের পরিমাণ কম হবে এবং কারখানাটির বর্জ্য পদার্থ শোধনকারী দামী যন্ত্রপাতি বসানোর কোনো কারণই থাকবে না। এমন কি, অবসর প্রাপ্তদের দ্রুত মৃত্যু সরকারী বীমা সংক্রান্ত অর্থ ভাণ্ডারের সঞ্চয়বৃদ্ধিও করতে পারে।

কোমারভের বইতে দেখা যাচ্ছে—সোভিয়েত সমাজে বিকট পরিবেশ সমস্যা আছে এবং সে সমস্যা ক্রমবর্ধমান। আর বড় বিস্ময়ের ব্যাপার হলো—সোভিয়েত সরকার অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন সে সমস্যাগুলি চাপা দেবার। □

রুশ দেশে পরিবেশ আন্দোলনের বিকাশ

[রুশ দেশেও পরিবেশ আন্দোলন বিকশিত হচ্ছে। আর তার বহিঃপ্রকাশ ঘটছে বিভিন্ন সোভিয়েত পত্র-পত্রিকায়। গত দু-তিন বছরের মধ্যে রুশ পত্রিকাগুলো রেকর্ড করা রাষ্ট্রীয় বক্তব্য থেকে অনেকটাই সরে এসেছে। নানান চাপে ও কৌশলগত কারণে সোভিয়েত সরকারও বাধ্য হচ্ছে বহু বক্তব্য প্রকাশ হতে দিতে। সচেতন মানুষদের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের কিছু নিদর্শন খণ্ডচিত্র হিসেবে আমরা প্রকাশ করছি। "সোভিয়েত দেশ" পত্রিকা থেকে এগুলি সংগ্রহ করেছেন প্রদীপ দত্ত। —স. ম.]

খণ্ডচিত্র 1

ভোলগা নদীর নাটক

ভোলগা নদীতে রয়েছে বিশ্বের স্টারজন মৎস্য ভাণ্ডারের সিংহভাগ। ...জনপ্রিয় সাপ্তাহিক 'অগনিয়োক'-এর এক সংবাদদাতা সম্প্রতি ভোলগার ওপর দিয়ে হেলিকপ্টারে করে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। তিনি দেখেছিলেন এক বেদনাদায়ক দৃশ্যঃ প্রচুর মাছ ভাসছে, প্রতি 40-50 মিটার অন্তর একটা স্টারজন অথবা সেভরুগা, কিন্তু সবকটাই ভাসছে চিৎ হয়ে। একজায়গায় নেমে দেখা মিলল বারোটা বড় স্টারজনের—সবকটাই মরা, মাছগুলোর পেট ভর্তি ডিম, কিন্তু তা নষ্ট হয়ে গেছে।

একই সময়ে মৎস্য দপ্তরের ইন্সপেক্টররা একটা কালো ক্ষত আবিষ্কার করলেন। এটা ছিল একশ মিটারেরও বেশী চওড়া আর কয়েক কিলো-মিটার লম্বা। এতে ছিল বর্জ্য তেল, আবর্জনা ও নোংরা জল।... কয়েকদিন পর মৎস্য প্রজনন কেন্দ্রগুলিতে মাছের চারা মরতে শুরু করল দৈনিক পঁচিশ লক্ষ হারে, কারণ কম্প্রেসারের মাধ্যমে ভোলগা থেকে প্রজনন কেন্দ্রগুলিতে জল ছাড়া হয়।...

নদীটিতে প্রতি বছর প্রায় 700 কোটি ঘন মিটার আবর্জনা নিক্ষেপ করা হয়, যার মধ্যে 100 কোটি হচ্ছে অশোধিত।...

শত শত বিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ, প্রযুক্তিবিদ ও ভূমি উন্নয়ন কর্মী এই প্রশ্নটি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন, যার উত্তরের দাম প্রায় 400 কোটি রুবল। এটাই হচ্ছে ভোলগা-চোগরাই খাল নির্মাণের অনুমানিক ব্যয়।...

ইতিমধ্যে বিষয়টির সাথে সম্পর্কিত শহরগুলিতে সাধারণ মানুষ রাস্তায়, চত্বরে আর নদীতীরে সমবেত হচ্ছে তাদের নেতাদের কেন্দ্র করে, কালিনিনে তাদের আছে 'ভোলগা বাঁচাও' সমিতি, মস্কোতে সামাজিক ও পরিবেশ সংঘ, কালমিকিয়ার রাজধানী এলিস্তায় কালমিক স্তেপ সংঘ। যদিও এই সব সমিতিগুলির নাম বিভিন্ন, তাদের লক্ষ্য কিন্তু একটাই। সরকার কি সিদ্ধান্ত নেয়, তা দেখার জন্য তারা আর অপেক্ষা করতে রাজি নয়, তারা এখনই ভোলগাকে রক্ষা করার জন্য পদক্ষেপ নিচ্ছে।

খণ্ডচিত্র 2

জৈব পরিবেশ ঃ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা
দেশ জুড়ে পরিবেশ সংরক্ষণ আন্দোলন
একটি বিপর্যয় ঃ আনগার্স্কে 1988র শরৎকালে

স্থানীয় একটি প্রোটিন ও ভিটামিন কনসেনট্রেটস কারখানার দূষক আকস্মিক ভাবে নির্গত হয়ে বায়ুমণ্ডলে মিশে এই 'মহামারী' ঘটিয়েছে। ...দুলক্ষ পঞ্চাশ হাজার জনসংখ্যা বিশিষ্ট এই শহরে 20টি রাসায়নিক ও অণুজীববিদ্যাগত কারখানা এবং তেল শোধনাগার আছে। সুতরাং দুর্ঘটনা না ঘটলেও, বাতাসে যে পরিমাণ বিপজ্জনক রাসায়নিক পদার্থ সঞ্চিত হয় তাও অনুমোদিত সীমার 100 থেকে 400 শতাংশ বেশি।

খুবই স্বাভাবিক, স্থানীয় বাসিন্দারা খেপে গিয়েছিলেন। শ'য়ে শ'য়ে তাঁরা 30 অক্টোবর শহরের কেন্দ্রীয় স্কোয়ারে জড়ো হন।

অক্টোবর বিপ্লব বার্ষিকী (1917) উপলক্ষে প্রদর্শনের সময়, স্থানীয় পরিবেশবাদী আন্দোলনের সদস্যরা একটি পৃথক শোভাযাত্রা বের করেছিলেন। তাঁদের হাতে ছিল প্রোটিন কনসেনট্রেটস কারখানা বন্ধের দাবি সম্বলিত পোস্টার। এমন একটি দিনে এ ধরনের বিক্ষোভ মিছিল অস্বাভাবিক বৈকি।

খণ্ডচিত্র 3

বিশুদ্ধ জল এবং মুক্ত বাতাসের জন্য

রুশ ফেডারেশনের বাশকির স্বায়ত্তশাসিত রাজধানী উফায় 'বিশুদ্ধ জল এবং মুক্ত বাতাস' পরিষদ তাদের শহরের জৈব পরিবেশগত পরিস্থিতির উন্নতি করার মূল লক্ষ্য অগ্রসর করতে গিয়ে একই সঙ্গে সামাজিক নিস্পৃহতা দূর করতে সাহায্য করছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে এক উদাসীন দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে উঠেছে। তাদের কোনো মতামত না নিয়েই সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে এই পরিস্থিতিতেই তারা অভ্যস্থ হয়েছিলেন। যত যা কিছুই ঘটুক না কেন, পরিষদ কিন্তু আত্মসমর্পণ করেনি। স্থানীয় বাসিন্দারা তাদের পাশে রয়েছেন।

খণ্ডচিত্র 4

সোভিয়েত 'গ্রীন' আন্দোলন দিনে দিনে বড় হচ্ছে। পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার জন্য বিভিন্ন গণসংস্থা জন্ম নিতে শুরু করেছে ?

বৈকালের তীরে গড়ে উঠেছে সংরক্ষণাগার, চারাগাছের বাগান এবং মনোরম প্রমোদ উদ্যান। এত কিছু সত্ত্বেও বৈকালের ওপরে জমে থাকা ধূসর ধোঁয়া দেখে বোঝা যায় দূষণ বৈকালকেও রেহাই দেয়নি। 1966 সাল থেকে নিকটবর্তী কাষ্ঠমণ্ড থেকে কাগজ তৈরীর স্থানীয় কারখানাটির চিমনি থেকে নির্গত বিষাক্ত ধোঁয়া সমগ্র পরিবেশকে দূষিত করে ফেলেছে। …(এই কারখানার) জায়গা বাছবার সময় একটি কথাই শুধু খেয়াল করা হয়নি যে দ্বিতীয় বৈকাল হ্রদ আর নেই।

জনগণের চাপে সোভিয়েত সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন 1993 সালের মাঝামাঝি কারখানাটি বন্ধ করে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার উপযোগী কোনো উৎপাদন সংস্থা গড়ে তোলা হবে। □

[সূত্র : সোভিয়েত দেশ পত্রিকার খণ্ড 40 সংখ্যা 6, জুন '89 এবং সংখ্যা 12 ডিসেম্বর '89]

With Best Compliments of :

B. C. CHATTREJEE & BRS.

10, HARI. PAL LANE
CAL-700006, PH : 35-4810

AUTHORISED STO KIST :

L. MARK (INDIA) LTD
GLAXO LABS
&
SISCO RESEARH LAB

পুনর্মুদ্রণ

স্টকহোম ঘোষণাপত্র

মানব পরিবেশ সুরক্ষায় দায়িত্ব ও অধিকার

[1972 সালেই 5ই জুন সুইডেনের স্টকহোমে জাতি সংঘের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত মানব পরিবেশ বিষয়ে প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে 113টি দেশের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতেঁ এই ঘোষণাপত্রটি রচিত হয় এবং মানব পরিবেশের "ম্যাগ্‌নাকার্টা" নামে পরিচিতি লাভ করে। এই আন্তর্জাতিক দলিলটি 26টি অনুচ্ছেদে বিভক্ত। প্রত্যেকটি অনুচ্ছেদের আগে আমরা একটি উপশিরোনাম সংযোজিত করে ইংরেজি থেকে বাংলা ভাবানুবাদ প্রকাশ করছি। অবশ্য আমাদের পত্রিকার মে-জুন 1983তে প্রকাশিত সংখ্যা থেকে এটি পুনর্মুদ্রিত হচ্ছে। বর্তমান বিশ্বের বন্যাহীন পরিবেশ হননের প্রেক্ষাপটে এই ঘোষণাপত্রটি কি অর্থময়তা হারিয়ে ফেলছে না ? —স. ম.]

এক ॥ মৌলিক অধিকার ঃ স্বাধীনতা, সাম্য ও সুপরিবেশ

স্বাধীনতা, সাম্য ও সুপরিবেশে বাঁচা সকল মানুষের মৌলিক অধিকার। পরিবেশ এমন সুস্থ, সুন্দর হওয়া প্রয়োজন যাতে সকলে মর্যাদা ও সমৃদ্ধির মধ্যে সুখে শান্তিতে বাঁচতে পারে। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সকল মানুষের জন্য তাই মানব পরিবেশের সুরক্ষা ও ক্রমোন্নতি বিধান সকল মানুষের মহান ও পবিত্র দায়িত্ব। এই পরিপ্রেক্ষিতে তাই বর্ণ বিদ্বেষ, জাতিভেদ ও ঔপনিবেশিকতাবাদ ধিকৃত হোক, হোক তাদের অবসান ও বিলোপ।

দুই ॥ পরিবেশের সুরক্ষা ঃ বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্যে

যথোপযুক্ত ব্যবস্থা ও পরিকল্পনার মাধ্যমে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মানুষদের কল্যাণের জন্যে বায়ু, জল, মাটি, উদ্ভিদ, জীবজন্তু—বিশেষ করে প্রতিনিধিত্বমূলক প্রাকৃতিক বাস্তুসংস্থানগুলি (representative samples of natural ecosystems) সমেত সকল প্রাকৃতিক সম্পদাবলীর সুরক্ষার ব্যবস্থা হোক।

তিন ॥ প্রকৃতির উৎপাদনশীলতা অক্ষুন্ন থাকে

পৃথিবীর নবীকরণ যোগ্য (renewable) প্রাকৃতিক সম্পদাবলীর উৎপাদন ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ থাকে। (অজ্ঞতা ও অবহেলায়) যা এতদিন বিনষ্ট হয়েছে, যতদূর সম্ভব তার পুনরুদ্ধার হোক।

চার ॥ আর একটি দায়িত্ব ঃ বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ

নানা প্রতিকূল অবস্থায় বন ও বন্যপ্রাণীগুলি আজ নানা ভাবে বিপর্যস্ত। এসবের সংরক্ষণ ও সুচিন্তিত পরিচালন আজ বর্তমান মানুষের এক বিশেষ দায়িত্ব। প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ মানুষের অর্থনৈতিক কর্মসূচীতে উপযুক্ত গুরুত্বসহকারে বিবেচিত হওয়া উচিত।

পাঁচ ॥ অনবীকরণযোগ্য সম্পদাবলী ব্যবহারের নীতি

পৃথিবীর অনবীকরণযোগ্য (non-renewable) সম্পদাবলীকে এমন ভাবে ব্যবহার করতে হবে যাতে আগামী বংশধররা সেগুলো একেবারে নিঃশেষ হয়ে যাবার বিপদে না পড়ে। এদের ব্যবহারের সুফল মানব জাতির সকল স্তরে পৌছনো উচিত।

ছয় ॥ স্মরণ থাক ঃ প্রকৃতির দহনক্ষমতা সীমিত

বিষাক্ত "রাসায়নিক", অন্যান্য পদার্থ ও উত্তাপকে এমন পরিমাণে এমন ঘনত্বে "ইকোসিস্টেমে" ছাড়া উচিত নয়, যা উক্ত ইকোসিস্টেমের নির্দোষক ক্ষমতার উর্ধে। দূষণ বাড়ালে ইকোসিস্টেম অপরিবর্তনীয় ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধে পৃথিবীর সকল দেশের সকল মানুষের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামকে সমর্থন ও সাহায্য করতে হবে।

সাত ॥ সাগর ও সামুদ্রিক প্রাণীদের বাঁচতে দিতে হবে

সকল রাষ্ট্রকে "সাগর দূষণের" বিরুদ্ধে সম্ভাব্য সবরকম ব্যবস্থা এমনভাবে নিতে হবে যাতে সামুদ্রিক প্রাণী, অন্যান্য জীবজন্তু ও সম্পদাবলীর উৎস সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত না হয় ; বিঘ্নিত না হয় মানুষের স্বাস্থ্য ও আইন সঙ্গত ব্যবহার ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা গ্রহণ।

আট ॥ প্রয়োজন ঃ মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন

পৃথিবীতে আরো সুন্দরভাবে বাঁচা ও কাজ করার পরিবেশ সৃষ্টির জন্য, জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য, চাই অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন।

নয় ॥ অনুন্নত ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবেশের জন্য চাই দ্রুত উন্নয়ন

অনুন্নত অবস্থা ও নানান প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলোর পরিবেশ খারাপ হচ্ছে এবং এসব প্রতিবিধানের পথ হল দ্রুত উন্নয়ন। এর জন্য উন্নয়নশীল দেশ সমূহের আভ্যন্তরীণ প্রচেষ্টাকে আর্থিক, প্রযুক্তিগত ও অন্যান্য সময়োপযোগী সাহায্য দেওয়া প্রয়োজন।

দশ ॥ পরিবেশের প্রয়োজন ঃ ইকোন্নয়ন ও মানুষের আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি

উন্নয়নশীল দেশ সমূহে জিনিসপত্রের দাম ঠিক থাকা উচিত, কৃষিপণ্য ও অন্যান্য কাঁচামালের ন্যায্য দাম মেলা উচিত, কারণ মানব পরিবেশের

সুরক্ষায় আর্থনীতিক ও ইকোলজিক্যাল কারণসমূহ ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত।

এগার ॥ পরিবেশ উন্নয়ননীতি কোথাও যেন উন্নয়নের অন্তরায় না হয়

রাষ্ট্রসমূহের পরিবেশ নীতি এমন হবে, যাতে উন্নয়নকামী দেশসমূহের উন্নয়ন সম্ভাবনা বাড়ে, কমে না যেন। নীতিসমূহ এমন হওয়া উচিত যাতে সেগুলো সকলের উন্নতমানের জীবন পাওয়ার পক্ষে কোনো বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। পরিবেশ সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে গিয়ে জাতীয় বা আন্তর্জাতীয় স্তরে আর্থনীতিক কোনো সমস্যা দেখা দিলে, রাষ্ট্রসমূহ বা আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ সহযোগিতার মাধ্যমে সেগুলির মোকাবিলায় এগিয়ে আসবেন।

বার ॥ পরিবেশ সুরক্ষা ঃ চাই আন্তর্জাতিক সহযোগিতা

পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্যে কিছু সম্পদ আগে থেকেই বরাদ্দ করে রাখতে হবে। উন্নয়নশীল দেশগুলি পরিবেশ বাঁচিয়ে উন্নয়নের ব্যবস্থা করতে গিয়ে যেসব অবস্থা ও অসুবিধেয় পড়বে, তার জন্যে—যদি অনুরোধ আসে—তবে আন্তর্জাতিক স্তর থেকে কারিগরি ও আর্থিক সাহায্য দিতে হবে।

তের ॥ পরিবেশ বাঁচিয়ে উন্নয়ন সম্ভব

সম্পদের সুষম বণ্টন ও পরিবেশের উন্নতির জন্য রাষ্ট্র সমূহের উন্নয়ন কর্মসূচী সুসংহত ও সামগ্রিক হওয়া প্রয়োজন। মানুষের কল্যাণের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা এমনভাবে গ্রহণ করতে হবে যাতে পরিবেশের সুরক্ষা ও উন্নয়ন হয়।

চোদ্দ ॥ উন্নয়ন ও পরিবেশ রক্ষার সম্ভাব্য বিরোধ

পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করতে গিয়ে সামাজিক ও আর্থনীতিক উন্নয়ন যাতে ব্যাহত না হয়, তার জন্যে উন্নয়ন প্রকল্পে বিজ্ঞানকে প্রয়োগ করতে হবে।

পনের ॥ মনুষ্যবসতি ও নাগরিকতা বৃদ্ধি

মনুষ্য বসতি ও নাগরিকতা (urbanisation) বাড়াতে পরিকল্পনা এমনভাবে রচনা ও প্রয়োগ করতে হবে যাতে মানব পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত না হয় এবং সকলে সর্বাধিক সামাজিক আর্থনীতিক ও পরিবেশীয় সুবিধা ভোগ করতে পারে। তার জন্যে ঔপনিবেশিকতা ও জাতিগত আধিপত্য বর্জন করতে হবে।

ষোল ॥ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ

যে সব অঞ্চলে জনসংখ্যার স্বল্পতা উন্নয়নের বাধা অথবা যেখানে জনসংখ্যার ঘনত্ব ও বৃদ্ধির হার মানব পরিবেশ বা উন্নয়নের প্রতিবন্ধক, সে সব স্থানে সেই সব জনসংখ্যা নীতি প্রয়োগ করা যেতে পারে যা সেখানকার সরকারগুলি উপযুক্ত বিবেচনা করেন এবং যেগুলি মানুষের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করে না।

সতের ॥ পরিকল্পনা ও পরিচালনা

মানব পরিবেশের উন্নতির স্বার্থে জাতীয় স্তরে পরিবেশ পরিকল্পনা ও পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠান সমূহ থাকবে, যারা পরিকল্পনা ও সম্পদাবলীর নিয়ন্ত্রণ ও সুব্যবস্থাদি করবেন।

আঠার ॥ চাই বিজ্ঞানের সুপ্রয়োগ

মানুষের সামগ্রিক কল্যাণের জন্যে এবং পরিবেশীয় বিপদ ও সমস্যাবলী চিহ্নিত করা, এড়ানো ও নিয়ন্ত্রণের জন্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যাকে আর্থনীতিক ও সামাজিক উন্নয়নে কাজে লাগাতে হবে।

ঊনিশ ॥ পরিবেশীয় শিক্ষা

বয়স্ক লোকেরা—বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের তরুণ-তরুণীরা যাতে ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও সমষ্টিগতভাবে পরিবেশ সুরক্ষা ও উন্নয়নে দায়িত্বশীল ভূমিকা নিতে পারে এবং এসব বিষয়ে আলোকপ্রাপ্ত সুচিন্তিত মতামত দিতে পারে, তার জন্যে অনুন্নত অঞ্চলের মানব গোষ্ঠীরও কথা মাথায় রেখে, সকলের জন্যে পরিবেশীয় শিক্ষার উপযুক্ত বন্দোবস্ত করতে হবে। গণমাধ্যমগুলি এমন কিছু করবে না যা মানব পরিবেশের ক্ষতির কারণ হয়, বরং তারা সার্বিক বিকাশের জন্য শিক্ষামূলক সংবাদ ও তথ্যাদি এমনভাবে পরিবেশন করবে যাতে পরিবেশীয় সুশিক্ষার বিস্তার হয়।

কুড়ি ॥ উন্নয়ন ও গবেষণামূলক বৈজ্ঞানিক কাজকর্ম

মানব পরিবেশ সংক্রান্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতীয় সমস্যাবলী নিয়ে বৈজ্ঞানিক কাজকর্মকে সর্বত্র—বিশেষ করে অনুন্নত দেশসমূহে—উৎসাহ দিতে হবে। এই সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক তথ্যাবলী ও অভিজ্ঞতার অবাধ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে পরিবেশীয় সমস্যাবলীর সমাধানের সুবিধে হয়। উন্নয়নশীল দেশ সমূহের জন্য সহজ ও সুলভ শর্তে পরিবেশীয় প্রযুক্তির সরবরাহ ও সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করতে হবে।

একুশ ॥ প্রাকৃতিক সম্পদ, মানব পরিবেশ ও রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব

রাষ্ট্রসঙ্ঘের শর্তাবলী ও আন্তর্জাতিক নীতি সমূহ মেনে প্রত্যেক রাষ্ট্রই তার নিজের দেশের পরিবেশীয় নীতি অনুযায়ী তাদের নিজস্ব প্রাকৃতিক সম্পদাবলীর সদ্ব্যবহারের সার্বভৌম অধিকারী থাকবে। সেই রাষ্ট্রের অবশ্য এ দায়িত্বও থাকবে যাতে তাদের এলাকা বা নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চল থেকে উদ্ভূত কোনো পরিবেশীয় সমস্যা অন্য কোনো রাষ্ট্রের অসুবিধে বা ক্ষতির কারণ না হয়।

বাইশ ॥ যারা অপরের দূষণে ক্ষতিগ্রস্ত

পরিবেশ দূষণের শিকার ব্যক্তি বা অঞ্চলের ক্ষতি ও অন্যান্য অসুবিধের দায়িত্ব ও উৎস সনাক্তকরণ ও তাদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থাদি করার জন্যে রাষ্ট্রগুলি পারস্পরিক সহযোগিতা করে আন্তর্জাতিক আইনগুলিকে উন্নত ও প্রতিষ্ঠিত করবে।

তেইশ ॥ পরিবেশীয় মান ও আন্তর্জাতিক নীতি প্রয়োগ

আন্তর্জাতিক স্তরে গৃহীত পরিবেশীয় মান সম্পর্কিত নীতিগুলির বিরোধী কিছু না করে, এবং একই সঙ্গে প্রত্যেকটি দেশের প্রচলিত

মূল্যবোধগুলিকে বিবেচনা করে, জাতীয় স্তরের নীতিসমূহ নির্দ্ধারণ করা প্রয়োজন। এছাড়াও, সুউন্নত দেশগুলির পক্ষে পরিবেশীয় মানকে যতদূর পর্যন্ত প্রয়োগ করা সম্ভব, কোনো উন্নয়নশীল দেশে ঐ মান ততদূর প্রয়োগ করার চেষ্টা কতোখানি যথাযথ বা এর জন্য কতোখানি সামাজিক মূল্য দিতে হবে, তাও বিবেচনা করা দরকার।

চব্বিশ ॥ সহযোগিতার আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র প্রশস্ততর হোক

মানব পরিবেশের সুরক্ষা ও উন্নয়নের জন্যে আন্তর্জাতিক স্তরে যা যা করা দরকার, সমমর্যাদা ও সহযোগিতার ভিত্তিতে তা ছোট বড় সব দেশের দ্বারা করতে হবে। সকল দেশের সার্বভৌমত্ব ও আগ্রহ বজায় রেখে দ্বিপক্ষীয় বা বহুপক্ষীয় বা অন্য কোনো উপযুক্ত পদ্ধতিতে পরিবেশদূষণ নিরোধক, নিবারক বা উন্নয়ক কাজকর্মের জন্য সহযোগিতার ক্ষেত্র বিস্তৃত করতে হবে।

পঁচিশ ॥ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির ওপর নজরদারী

রাষ্ট্রগুলির কাজ হবে এটা দেখা যাতে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি সুসংবদ্ধ ও কার্যকরভাবে মানব পরিবেশের সুরক্ষা ও উন্নয়ন করতে পারে।

ছাব্বিশ ॥ পরমাণু ধ্বংস থেকে মানবপরিবেশকে বাঁচাতেই হবে

পরমাণু ও ব্যাপক ধ্বংসক্ষম অস্ত্রসমূহের কুফল থেকে মানুষ ও পরিবেশকে বাঁচাতেই হবে। উপযুক্ত আন্তর্জাতিক মঞ্চে রাষ্ট্রগুলিকে এইসব অস্ত্রসমূহ বাতিল ও ধ্বংস করার জন্য একমত হতে সর্বদা প্রয়াস চালাতেই হবে। □

অনুবাদ ঃ মণীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার
স্বপন কুমার শীল

প্রতিবেদন

বড় বাঁধ—নর্মদা ঃ একটি আলোচনা

আজ ভারতের "বাঁধ-ক্লিষ্ট" নদনদী খবরের কাগজের পাতা ছাড়িয়ে কোথাও কোথাও জোয়ার তুলছে আন্দোলনের আঙিনায়ও। কিন্তু কেন? এই প্রশ্নে কেন্দ্রীভূত ছিল পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার 28শে জুলাই 1990-র আলোচনা চক্র। সাহা ইনস্টিটিউট অফ্ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স অডিটোরিয়ামে কিছু বিলম্বে শুরু হলেও, দর্শক-শ্রোতার সংখ্যা আশানুরূপ না হলেও, সমগ্র অনুষ্ঠানখানি মনোজ্ঞ হয়ে ওঠে।

নর্মদা প্রকল্পের বিরুদ্ধে যে সংগঠিত আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছে, সে আন্দোলনের সথে সরাসরি জড়িত সমাজকর্মী রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বক্তব্যে নর্মদা বাঁধের সমর্থনকারী আমলা ও রাজনীতিবিদদের তাৎক্ষণিক লাভের বিপরীতে স্থানীয় মানুষজন ও প্রকৃতির বিপুল ক্ষতির সম্ভাবনার বিস্তৃত বিবরণ দেন। বিদেশে প্রভাব সৃষ্টিকারী এই আন্দোলনের কর্মীরাও পুলিসী নিগ্রহ থেকে রেহাই পাচ্ছেন না। হ্যাঁ, নবম লোকসভা নির্বাচনের পরেও এ চিত্র দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। মনোহর মুর্মু বলেন—বড় বাঁধ বড় প্রকল্প যেখানেই হোক আদিবাসীদের উচ্ছেদ করা হয়। গুজরাটে পাঁচ জন আদিবাসী সাংসদ আছেন। কিন্তু তাঁরা লোকসভায় কোনো প্রতিবাদী বক্তব্য রাখেন না। সাংবাদিক নিরঞ্জন হালদার বলেন—পরিবেশ মন্ত্রক ও যোজনা কমিশনের অনুমোদন ছাড়াই নর্মদা প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। বিদেশে বড় বাঁধ নির্মাণ বন্ধ হয়ে গেছে। অথচ আমাদের এখানে একাধিক বড় বাঁধ নির্মিত হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, আমরা চাই ছোট ছোট বাঁধ। বড় বড় বাঁধের বিরুদ্ধে আমরা।

নিশীথ চৌধুরীর প্রাসঙ্গিক ছড়া পাঠ উপভোগ্য হয়। বিগত 28শে সেপ্টম্বর 1989 মধ্যপ্রদেশের হরসুদে (নর্মদা প্রকল্প যে শহরকে জলের তলায় পাঠাবে) যে বিক্ষোভ জমায়েত হয়েছিল ভাষ্য সহযোগে তার প্রামাণ্য স্লাইড-চিত্র প্রদর্শন করেন শ্যামল। সভাগৃহের দেওয়ালে ছিল নানা পোস্টার।

এই অনুষ্ঠানে প্রকাশিত হয় পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার মুখপত্র "বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী"র বিশেষ নর্মদা সংখ্যা। নিরঞ্জন হালদার সম্পাদিত "নর্মদার কান্না" (প্রকাশক ঃ উন্নয়ন) বইখানিও একই সাথে প্রকাশিত হয়। এ বইটির রয়ালটির টাকা "নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের" প্রাপ্য বলে ঘোষিত হয়। সব শেষে নর্মদা বাঁধের বিরুদ্ধে সংগঠিত আন্দোলনের একটি তথ্যচিত্র দেখানো হয় ভিডিও ক্যাসেটে।

আয়োজক সংস্থার পক্ষে আলোচনা শুরু করেন অসীম মুখোপাধ্যায়। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সংস্থার রবীন মজুমদার। □

প্রতিবেদক

পরিবেশ ছড়া

ছড়া : নিশীথ চৌধুরী
ছবি : সুপর্ণ চৌধুরী

কংস

সুন্দর পরিবেশ
যারা করে ধ্বংস,
চিনে নাও তারা সব
এ যুগের কংস

ব্যাণ্ডেল

ব্যাণ্ডেলে ছাই ওড়ে
বাড়া ভাতে ছাই,
ছাই থেকে ভিটামিন
তুলনা যে নাই।

তিলোত্তমা

চতুর্দিকে খন্দ-খানা
ময়লা জ'মে পাহাড়,
বৃষ্টি হ'লে জলে কাদায়
আহা কি তার বাহার!
কলিকাতা তিলোত্তমা
নামটি হ'ল তাহার।

গঙ্গা-দূষণ

গঙ্গা-দূষণ
হ'চ্ছে কিসে বল'তো ?
মানুষ গরু
ছাগল ভেড়ার মল'তো।
ঢালতে হবে
হাজার লিটার দুগ্ধ,
গঙ্গা এবার
হবেই হবে শুদ্ধ।

সন্ধি

নাচে গানে পরিবেশ
পরিবেশ 'বুলি'তে,
পরিবেশ আঁকা হয়
শিল্পীর তুলিতে।
পরিবেশ কেঁদে বলে—
'আমি আজ বন্দী,
দূষণের সাথে আজ
সকলের সন্ধি'।

চিঠিপত্র

"র‍্যাডিক্যাল অ্যানথ্রোপলজি"র র‍্যাডিক্যালত্ব কোথায় ?

"বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী"-র বিশেষ নর্মদা সংখ্যায় গেল ওস্তেটের "ভারতীয় সভ্যতার উৎস সন্ধানে—অবহেলিত সংস্কৃতি, উপেক্ষিত ইতিহাস" লেখাটি পড়ে দু'একটা জায়গায় কিছুটা বোঝার অস্বস্তি দেখা দিয়েছে। সেই প্রসঙ্গে এই চিঠির অবতরণা।

প্রথমটি লেখাটির প্রাক্‌কথন সম্পর্কিত। শেষের দিকে বলা হয়েছে সভ্যতার সামগ্রিক চেহারায় বঞ্চিত জনগোষ্ঠীদের অবদানের কথা তুলে ধরতে সাহায্য করেছে "র‍্যাডিক্যাল অ্যানথপলজি"। আমার আপত্তি ঐ "র‍্যাডিক্যাল" অভিধাটিতে। নৃতত্ত্ব সম্পর্কিত সামান্য কিছু পড়াশুনো থেকে (এ বিনয় নয়, নির্জলা সত্যভাষণ) মনে হয়েছে প্রথানুযায়ী নৃতত্ত্বও তো এই একই কাজ করে চলেছে, যেকোনো নৃতত্ত্বের প্রাথমিক পর্যায়ের ছাত্রপাঠ্য বইগুলোও তো একই ভূমিকা নিয়েছে। তবে আর নৃতত্ত্বের আগে র‍্যাডিক্যাল বিশেষণটি কেন? আমরা তো তখনই নূতন কোনো বিশেষণ ব্যবহার করব যখন পুরনো বিশেষণগুলোতে কাজ আর চলছে না, নূতন ভাব প্রকাশে দরকার পড়ছে নূতন শব্দের। আসলে যথেচ্ছ র‍্যাডিক্যাল শব্দটি ব্যবহার করে আমরা শব্দটির ধারই বোধ হয় কমিয়ে দিচ্ছি। এ বোধহয় একধরনের অস্তিত্বের সংকটের সূচকও। মধ্যবিত্ত সমাজকর্মীরা বোধহয় তাদের তথাকথিত পেটি বুর্জোয়া ব্যাক গ্রাউণ্ডের জন্য কুণ্ঠিত বোধ করেন আর তাই র‍্যাডিক্যাল কথাটির সঙ্গে সাযুজ্য স্থাপন করে একধরনের বিপ্লবীসুলভ আত্মপ্রসাদ অনুভব করেন। আর এই ভাবেই একটি শব্দ পরিণত হয় একধরনের ফেটিশে।

এবার দ্বিতীয় আপত্তিটির কথায় আসি। এটি মূল লেখার সঙ্গে সম্পৃক্ত। কাজেই সরাসরি দায় পত্রিকাগোষ্ঠীর নয়। তবু বলেই ফেলি। লেখিকা বলছেন খ্রীষ্টপূর্বাব্দ তিন হাজার সনের আশেপাশে থাইল্যাণ্ডের কোনো একটি স্থানে সর্বপ্রথম জন্তুদের গৃহপালিত করার নজির মিলেছে। কিন্তু পুরাতত্ত্ব তো বলে প্রাণী পোষ মানানোর নজির আরো পুরনো। ইরাকের শানিডার (Shanidar), জারমো প্রমুখ স্থানে তো ছয় হাজার খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ছাগল, কুকুর এসব প্রাণীদের পোষ মানানোর নজির আছে। শুধু ইরাকেই বা বলি কেন গোটা ফার্টাইল ক্রেসেণ্টেই তো তার নজির ছড়িয়ে আছে। আগ্রহী পাঠকের উদ্দেশে বলি, পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন সবসময়ই অপ্রত্যক্ষ প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত। কাজেই এখানেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। পূর্বকথিত এলাকায় বুনো ছাগলের বৈশিষ্ট্যসূচক শিঙের গড়ন তাদের পোষা ছাগলদের থেকে সহজেই আলাদা করতে সাহায্য করে। কাজেই যেখানে মনুষ্যবসতির চিহ্ন পাওয়া গেছে, সেখানে যদি এখনকার পোষা ছাগলের অনুরূপ ছাগদেহাবশেষ মেলে তা থেকে আঁচ করা যেতে পারে এরাও গৃহপালিত ছিল। এই যে বর্তমান থেকে অতীতের ঘটনাবলী সম্বন্ধে অনুমান করা (Uniformitarianism Principle) এ বিজ্ঞানের এক স্বীকৃত পন্থা। আবার একটি স্বাভাবিক গোষ্ঠীতে নারী/পুরুষ এবং বৃদ্ধ/তরুণের সংখ্যার অনুপাত হওয়া উচিত প্রায় সমান সমান। কিন্তু আমরা যদি দেখি একটি জায়গায় (যেখানে জনবসতির চিহ্ন আছে) পুরুষ এবং অপেক্ষাকৃত কমবয়সী ছাগলের সংখ্যা মাত্রাতিরিক্ত ভাবে বেশী তবে অনুমান করা যেতে পারে খাদ্যের প্রয়োজনে এদের হত্যা করা হয়েছে। মাদী এবং বৃদ্ধ ছাগলদের প্রজননের উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত করা হয়েছে। কাজেই সংখ্যার অনুপাতের হেরফেরও আমাদের এই ব্যাপারে সাহায্য করে। [সূত্র : এম্বারের অ্যানথেপলজি, পৃঃ 150, 2nd Edition 1977]

আর এক জায়গায় লেখিকা বলেছেন প্রযুক্তির বিকাশের ধারাটিকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কিছুদূর পর্যন্তে এগিয়ে নিয়ে স্তিমিত বা শ্লথ করা হয়েছে। কেননা প্রযুক্তির তুলনায় সাম্যই কাম্য ছিল তাদের কাছে। এ জায়গাটা পড়ে আমার মনে হয়েছে একটি জনগোষ্ঠী যেন প্রযুক্তির বিকাশের পথে কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে সচেতনভাবে স্থির করতে পারে প্রযুক্তির বিকাশের গতি। যেন রাজা ক্যানিউটের মত বলতে পারে—"This far and no further"। হয়ত বোঝার ভুল। কিন্তু সত্যি কি প্রযুক্তির বিকাশের গতি নিয়ন্ত্রণ একটি অপেক্ষাকৃত অবিকশিত জনগোষ্ঠীর পক্ষে সম্ভব? ক্রমাগত জনসংখ্যার চাপ (আনুষঙ্গিক আরো কারণে) তাদের বাধ্য করবে খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে আর তাই দরকার পড়বে ক্রমাগত প্রযুক্তির বিকাশের। এর ব্যতিক্রম তো অন্য কোথাও চোখে পড়ে না, তাহলে নিশ্চয়ই এখানে অন্য কোনো কারণ ছিল।

এটা ঠিক যে মূল খেলায় ভুল বোঝাবুঝির কোনো অবকাশ থাকলে তার দায় পুরোটা পত্রপত্রিকাগোষ্ঠীর নয়। তবে এইধরনের বিতর্কিত অর্ধসিদ্ধ তথ্য পরিবেশনের সময় পাদটীকা সংযোজনের দায় বোধহয় পত্রিকাগোষ্ঠীর থেকেই যায়। □

সুজয় মোদক
লেকটাউন
কলকাতা

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে গড়ে তুলুন দূষণমুক্ত পৃথিবী

বিভিন্ন ধরণের পরিবেশ দূষণ বর্তমান যুগে আমাদের সামনে কঠিন সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এই পরিস্থিতি কিন্তু একদিনে তৈরি হয়নি। প্রাকৃতিক নিয়মগুলিকে অগ্রাহ্য করে মানুষ আধুনিক জীবনের ক্রমবর্ধমান ও জটিল চাহিদার সামাল দিতে নানাভাবে প্রকৃতির কাজে হস্তক্ষেপ করেছে। উন্নততর জীবনযাত্রার প্রয়োজনে মাটি, জল, অরণ্য ও খনিজ সম্পদকে অবাধে মানুষ ব্যবহার করেছে—অতিব্যবহারের ফলে যে ক্ষতি তা পূরণের ব্যবস্থা না করেই। ফলশ্রুতি হিসাবে এই গ্রহে আমাদের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন।

অবাধ বৃক্ষছেদন, কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ ঢেলে নদীর নির্মল স্রোতকে রুদ্ধ করা, যানবাহন ও কারখানা থেকে নিঃসৃত বিষাক্ত গ্যাস এবং ধোঁয়া ও কর্কশ উচ্চগ্রামের শব্দ আমাদের পরিবেশ দূষণের শিকার করে তুলেছে।

কিন্তু আমরা কি সম্ভাব্য এই বিপদ সম্বন্ধে অবহিত ?

যদি এই অবস্থা চলতে থাকে তাহলে অচিরেই পৃথিবী থেকে অরণ্য লুপ্ত হয়ে যাবে, খরা এবং বন্যার কবলে পড়বে পৃথিবী, প্রাণী ও উদ্ভিদজগতের অসংখ্য প্রজাতি চিরদিনের মত বিলুপ্ত হবে, আমাদের এই সুন্দর গ্রহের বাতাস হয়ে পড়বে নিঃশ্বাস নেবার অযোগ্য এবং এ সমস্তই ঘটবে আমাদের অপরিণামদর্শিতা, লোভ ও প্রাকৃতিক সম্পদের ক্রমবর্ধমান চাহিদার জন্য।

উন্নয়নমূলক কাজকর্ম আমাদের চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু তা করতে হবে প্রাকৃতিক ভারসাম্যের হানি না ঘটিয়ে। নিষেধমূলক আইনের যথাযথ প্রয়োগ এবং আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে আমরা এই বিপদের মোকাবিলা করতে পারি।

পরিবেশ সংরক্ষণের কাজে ব্রতী হতে হবে। আমাদের সকলকেই প্রস্তুত হতে হবে দূষণমুক্ত পৃথিবী গড়ার উদ্দেশ্যে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের জন্য।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই, সি, এ, ৩৮৩৯/৯০.

জে. বি. এস. হলডেনের 99তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে

গণদর্পণের আয়োজনে

5ই নভেম্বর '90 থেকে 11ই নভেম্বর '90 বিজ্ঞানমনস্কতা প্রসার সপ্তাহ পালন

অনুষ্ঠান সূচি ঃ

5ই নভেম্বর

আলোচনা ঃ হলডেন ও বিজ্ঞানমনস্কতা

বিজ্ঞানমনস্কতা ও মরণোত্তর দেহদান

স্থান ঃ ইণ্ডিয়ান ইনসটিটিউট অফ কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার্স, যাদবপুর

6ই নভেম্বর থেকে 11ই নভেম্বর

বিজ্ঞান রথ নিয়ে

কলকাতা, উত্তর চব্বিশ পরগণা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা,

হুগলী বর্ধমান, বাঁকুড়া ও হাওড়ার পথ পরিক্রমা

যোগাযোগ ঃ গণদর্পন

32 ডি, ডি. এন. ঘোষ রোড

কলকাতা-700 025

ভুল সংশোধন

পৃষ্ঠা	কলাম	লাইন	কী ছাপা হয়েছে	কী পড়তে হবে
1	1	5	অলংকৃত্ত	অলংকৃত
2	1	25	লবী	লবি
3	2	শেষ	পরিষ্কার	পরিষ্কার
5	2	5	বৈদেশীক	বৈদেশিক
9	1	24	বিশুদ্ধানন্দা	বিশুদ্ধানন্দ
12	1	12	তেজস্কিয়	তেজস্ক্রিয়
		17	ঐ	ঐ
		22	ঐ	ঐ
		24	ঐ	ঐ
16	1	11	তেজস্কিয়	তেজস্ক্রিয়
17	2	23	জুড়ে	জুড়ে
18	2	7	ধুসর	ধূসর
19	1	5	উপস্থিতিতেঁ	উপস্থিতিতে
23	1	7	অ্যানথপলজি	অ্যানথ্রোপলজি
23	2	11	অ্যানথেপলজি	অ্যানথ্রোপলজি
23	2	27	পত্রিকাগোষ্ঠীয়	পত্রিকাগোষ্ঠীর

R. N. 34929/79
YEAR 13 NUMBER 6

A bi-monthly magazine
VIGYAN-O-VIGYANKARMI
c/o A. Lahiri
B2 Baisakhi, 153/1 Jessore Road, 700074
May-June, 1990

"আমরা কারা ?—আমরা বাঙালি।"
"বিহারের সাঁওতাল পরগণার লোকদের সাঁওতালী বলে।
"খাল, বিল প্রভৃতি জলাশয়ের কাদা বছরে বছরে স্তরে স্তরে শুকাইয়া স্লেট হয়।"
"যে শিরা দিয়ে দেহের নানা স্থান থেকে রক্ত হৃৎপিণ্ড ফিরে আসে তাকে শিরা বলে।"
"কলেরার ইঞ্জেকশন ও টীকা নেওয়া উচিত।"
"প্রত্যহ স্নানের সময় কানে সরিষার তেল দিতে হয়। ইহাতে ময়লা বা খইল জমে না। কালে খইল জমলে পালক বা কান-খুচানী দিয়ে কান পরিষ্কার করবে।"
"আদিম যুগের মানুষদের বলা হয় আদিবাসী।"
"সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে পৃথিবীর সময় লাগে 24 ঘণ্টা।"
"সর্বাপেক্ষা ছোট গ্রহ মঙ্গল।"

প্রাইমারি স্কুলের ছেলেমেয়েদের মগজে বিজ্ঞানশিক্ষার নামে এমন সব বিকৃত তথ্য ঠাসার কাজ চলছে। এবিষয়ে মন নাড়ানো বিশ্লেষণ

রবীন মজুমদারের
পুস্তিকা
বিজ্ঞানশিক্ষা ঃ প্রাথমিক হালচাল
দাম ঃ তিন টাকা

বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম নিউক্লিয়ারবিরোধী পুস্তিকা
সৌমেন গুহর
না,
হিরোশিমা নাগাসাকি
চাই না
দাম ঃ তিন টাকা

প্রকাশক ঃ পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা
প্রযত্নে ঃ অভিজিৎ লাহিড়ী
B2 বৈশাখী, 153/1 যশোহর রোড, কলকাতা 700074

সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে রবীন মজুমদার কর্তৃক ইটারনিটি প্রেসের পক্ষে বিশ্বাস প্রিন্টিং হাউস, ১৩০ কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯ থেকে প্রকাশিত।